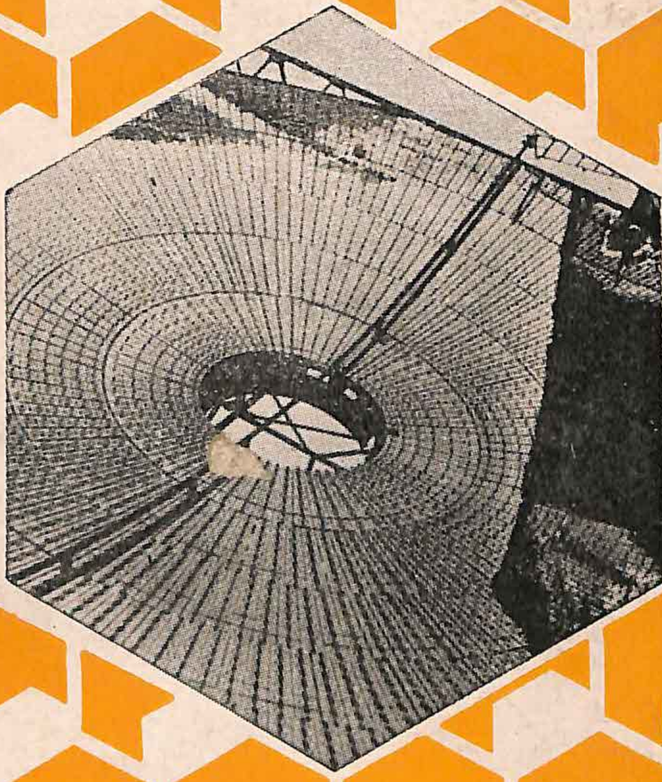
সৌরশক্তি

আনন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

বিজ্ঞান পুস্তিকা

সৌরশক্তি

ডঃ আনন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পি. এইচ. ডি.
টেকনিক্যাল অফিসার, ক্লোরাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেড

ও

ডঃ রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পি. এইচ. ডি.
অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ

SAURASAKTI
[Solar energy]
Dr. Ananda Kumar Bandyopadhaya
&
Dr. Rupendra Nath Bandyopadhaya

প্রকাশকাল :
প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ১৯৮৬

প্রকাশক :
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ,
(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা),
আর্য মানসন (নবম তল),
৬এ, রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
কলিকাতা-৭০০০১৩

মুদ্রক :
শ্রীপ্রবীরকুমার পান
লক্ষ্মী সরস্বতী প্রেস
২০৯বি, বিধান সরণী
কলিকাতা-৭০০০০৬

চিত্রাংকন : এল্ কর্মকার

প্রচ্ছদ : বিমল দাশ, দুর্গা রায়

মূল্য : নয় টাকা

Published by Dr. Ladli Mohon Roychoudhury, Chief Executive Officer, West Bengal State Book Board under the Centrally Sponsored Scheme of production of books and literature in regional languages at the University level of the Government of India in the Ministry of Human Resources Development (Department of Education New Delhi.

বাবা, মা-কে

যাঁদের অসীম আত্মত্যাগ ও
অপরিমেয় করুণার দানে
আলোর পরশ পেয়েছি।

● আমাদের কথা ●

একদিকে সভ্যতার অগ্রগতির দরুন জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন আর অন্যদিকে জনসংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধি—এই দুই-এর চাপে শক্তি-চাহিদা চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলেছে। সভ্যতার অগ্রগতি অপ্রতিরোধ্য। তাই এই ক্রমবর্ধমান শক্তি-চাহিদা ঠেকিয়ে রাখাও সম্ভব না। এদিকে কয়লা, পেট্রোলিয়াম, গ্যাস ইত্যাদি প্রচলিত শক্তি উৎসগুলি প্রকৃতিতে অফুরন্ত নয়। আবার পরমাণু শক্তিকে উৎস হিসেবে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে এর ক্ষতিকারক প্রতিক্রিয়া ও কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নত মানের পরমাণু জ্বালানীর অভাব। অদূর ভবিষ্যতে সভ্যতা যাতে বিপন্ন না হয় সেই জন্যে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছে। বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে তাই প্রয়োজন হয়েছে অপ্রচলিত উৎস খুঁজে বার করা। এমনই একটি অপ্রচলিত অথচ অফুরন্ত উৎস হল সৌরশক্তি। সূর্যের কিরণ থেকে এই শক্তি পাওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন এই শক্তি বিপুল পরিমাণে পৃথিবীতে এসে পৌঁছচ্ছে। একে কাজে লাগাতে পারলেই তো বাজিমাৎ! তাহলে আর সমস্যা কোথায়? সমস্যা আছে অনেক। সবচেয়ে বড় সমস্যা হল এই শক্তি সংগ্রহ করে কাজে লাগানোর গ্রহণযোগ্য কৌশল বার করা। এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার জন্যে বিশ্বজুড়ে চলেছে এক কর্মযজ্ঞ। গবেষণাগারের চার দেওয়ালের সীমানা ছাড়িয়ে এই আলোড়ন পৌঁছে দিতে হবে সাধারণ মানুষের ঘরে ঘরে। চাই এর ব্যাপক প্রয়োগ। তাই বিজ্ঞানীর সাফল্য শুধু নয়, সাধারণ মানুষের সক্রিয় সহযোগিতাও একান্ত কাম্য। এই কারণে আজ প্রয়োজন হয়েছে পরিস্থিতির গুরুত্ব সম্পর্কে সবাইকে সচেতন করা ও এই নতুন উৎস সম্বন্ধে সবার মনে উৎসাহ জুগিয়ে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানিয়ে নেওয়ার মানসিক প্রস্তুতি গড়ে তোলা। এই উদ্দেশ্য নিয়েই বর্তমান বইখানি লেখা হয়েছে। সৌরশক্তি কি, কিভাবে একে কাজে লাগানো যায়, এ ব্যাপারে কাজ কতটুকু এগিয়েছে, কি, কি সমস্যা রয়েছে—এমনই নানান বিষয় আলোচনায় স্থান পেয়েছে।

একটি বিজ্ঞান পুস্তিকার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হল বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্য। এই কথা মনে রেখেও বইটি লোকপ্রিয় করে তুলতে গূঢ় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ও তথ্যগুলি যতদূর সম্ভব হাল্কা করে ধালে হয়েছে। বিভিন্ন দেশী-বিদেশী বই ও পত্র-পত্রিকা

থেকে নেওয়া মাল-মশলা বর্তমান রচনায় প্রয়োজনীয় সর্বাধুনিক তথ্য ও রসদ জুগিয়েছে। একক হিসেবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে ইন্টারন্যাশানাল ষ্ট্যাণ্ডার্ড ইউনিট ; যার প্রচলন আজকাল বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে ক্ষেত্র বিশেষে অধিকতর পরিচিত এককগুলিও ব্যবহার করা হয়েছে। বাংলার পাশে ইংরাজী পরিভাষাও ক্ষেত্রবিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে—পরিভাষার জটিলতা এড়িয়ে বইকে সুখপাঠ্য করে তোলার উদ্দেশে।

অজান্তে যে ত্রুটি বিচ্যুতি রয়ে গেল এই লেখায় তার দায়িত্ব আমাদেরই। এগুলি দূর করতে গঠনমূলক সমালোচনা একান্ত কাম্য। সবশেষে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদকে, বইখানি প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করায়।

কলিকাতা
জন্মাষ্টমী, ১৩৯৩

আনন্দকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
রূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

● সূচীপত্র ●

● এক নজরে সূর্য ●

এক নজরে সূর্য :

সূর্যের (বর্তমান অবস্থার) বয়স	: পাঁচশ কোটি বছর
সূর্যের মোট আয়ু (কৃষ্ণ বামন দশা পর্যন্ত)	: 1-2 হাজার কোটি বছর
এই ছায়াপথে মোট নক্ষত্র সংখ্যা	: দশ হাজার কোটি (সূর্য এদেরই একটি)
সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব	: সর্বাধিক, 152,106,000 কিমি বা 94,519,000 মাইল (4ঠা জুলাই); সর্বনিম্ন, 147,103,000 কিমি বা 91,410,000 মাইল (3রা জানুয়ারী)
সূর্যের ব্যাস	: 1,392,000 কিমি বা 864,950 মাইল (পৃথিবীর ব্যাসের 109·3 গুণ)
সূর্যের আয়তন	: $1·412 \times 10^{18}$ঘন কিমি বা $3·387 \times 10^{17}$ ঘন মাইল (তের লক্ষ পৃথিবীর চাইতেও বেশী)
সূর্যের ভর	: $1·99 \times 10^{30}$ কিগ্রা বা $2·19 \times 10^{27}$ টন (পৃথিবীর তুলনায় 333,400 গুণ বেশী)
সূর্যের গড় ঘনত্ব	: 1·41 গ্রাম/ঘন সেমি
সূর্যের কার্যকরী তাপমাত্রা	: 5740°K
সূর্য থেকে প্রতি সেকেণ্ডে নিঃসৃত শক্তি	: $3·86 \times 10^{26}$ জুল
সূর্যের ঔজ্জ্বল্য	: $3·17 \times 10^{27}$ ক্যাণ্ডেল (পূর্ণ চন্দ্রের তুলনায় প্রায় $4\frac{1}{2}$ লক্ষ গুণ বেশী)
সূর্যের অভ্যন্তর	:
ঘনত্ব	: 150 গ্রাম/সি.সি.
তাপমাত্রা	: 20,000,000°K
চাপ	: 4×10^{17} ডাইন/সেমি^{2} (4×10^{11} বায়ুমণ্ডলীয় চাপ)

শক্তির বিকিরণের ফলে প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যের ভরক্ষয়	: 47 লক্ষ টন বা 427 কোটি কিগ্রা (সূর্যের মোট ভরের 10^{-19} ভাগ)
সূর্যে হাইড্রোজেনের বর্তমান পরিমাণ	: সূর্যের মোট ভরের 60 শতাংশ
তাপকেন্দ্রীন বিক্রিয়ায় আজ পর্যন্ত ব্যয়িত হাইড্রোজেন	: মোট পরিমাণের 1 শতাংশ
সূর্যে অভিকর্ষজ বল	: পৃথিবীর 28 গুণ

সৌরশক্তি

সূর্য ও শক্তি

"সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড একটি পুঞ্জীভূত শক্তি"—বিবেকানন্দ।

ছায়াপথ ও সূর্য ঃ

নির্মেঘ কোন শরতের রাতে আকাশের দিকে তাকালে চোখে পড়ে দিগন্তবিস্তৃত ঝাপসা আলোর মালা ; আমাদের ছায়াপথ—দশ হাজার কোটি নক্ষত্রের সমাবেশে সৃষ্ট আমাদের তারাজগৎ। এই দশ হাজার কোটি ছোট-বড় নক্ষত্রদের অন্যতম হল সূর্য। ছায়াপথের কেন্দ্র থেকে তিরিশ হাজার আলোকবর্ষ[1] দূরে অবস্থিত আমাদের পিতৃপ্রতিম সূর্য নক্ষত্রদের সভায় সব অর্থেই মাঝারি। তার দীপ্তি, আকৃতি, আচরণ সবই সাধারণ মাপের। বিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন "পীত বামন" ; জি—2 বর্ণালী গোষ্ঠীতে তার স্থান। তবুও অসংখ্য তারার ভীড়ে সূর্য আমাদের কাছ থেকে হারিয়ে যায় নি, কেননা সে হল আমাদের নিকটতম নক্ষত্র। তার তাপ ও আলো ব্যতিরেকে পৃথিবীতে কিছুই সৃষ্টি হত না। তাছাড়াও এই সূর্যকে দেখেই আমরা পরিচিত হই অন্য তারাদের সঙ্গে ; তাদের গঠন ও বিস্তারিত খবর জানতে পারি—বিশ্বসৃষ্টির রহস্যের কিছুটা আভাস পাই।

সূর্যের অমিত তেজ চিরকালই মানুষের কাছে এক বিস্ময়। প্রাচীনকালে তাই মানুষ সূর্যকে দেবতাজ্ঞানে পুজো করত। মিশরীয়দের রা (Ra), ফিনিশিয় ও কার্থেজবাসীদের মেল্‌কার্থ (Melkarth), গ্রীক ও রোমানদের অ্যাপোলো (Apollo), বাবিলনবাসীদের শেমাশ (Shamash), পারসীদের মিথ্‌রাজ (Mithras), স্লাভদের ইয়ারিলা (Yarila) হল হিন্দুদের 'সূর্যদেবের' নামান্তর। প্রতিটি প্রাচীন সভ্যতায় কোন না কোন সময়ে সূর্য উপাসনার প্রাধান্য ছিল বলে দার্শনিকরা মনে করেন। অন্ধ ধর্মীয় বিশ্বাসে প্রথম আঘাত করলেন গ্রীক দার্শনিক অ্যানাক্সাগোরাস্‌ (Anaxagorus) খৃষ্টপূর্ব 434 অব্দে। সূর্যকে একটি জ্বলন্ত পিণ্ড আখ্যা দিয়ে তিনি শুধু বিরূপ সমালোচনার মুখেই পড়েন

1. 1,86,000 মাইল/সেকেণ্ড গতিবেগ নিয়ে আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে, অর্থাৎ প্রায় 6×10^{12} মাইল বা $9{\cdot}4\times10^{12}$ কিমি।

নি, তাঁর নিজের জীবনও বিপন্ন করেছিলেন। এর বহু পরে সপ্তদশ শতাব্দীতে গ্যালিলিও (Galileo)-কেও অনুরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ক্রমে ক্রমে মানুষ বুঝতে শিখল যে সূর্যের সঙ্গে জীবনের সম্পর্ক কত নিবিড়! ফলে সূর্যের জন্মরহস্য, তার বিপুল তেজভাণ্ডারের রহস্য, তার আভ্যন্তরীণ চেহারা, তার ভবিষ্যৎ এসব নিয়ে মানুষের কৌতুহলের শেষ নেই।

সূর্য ও তার স্বরূপ ঃ

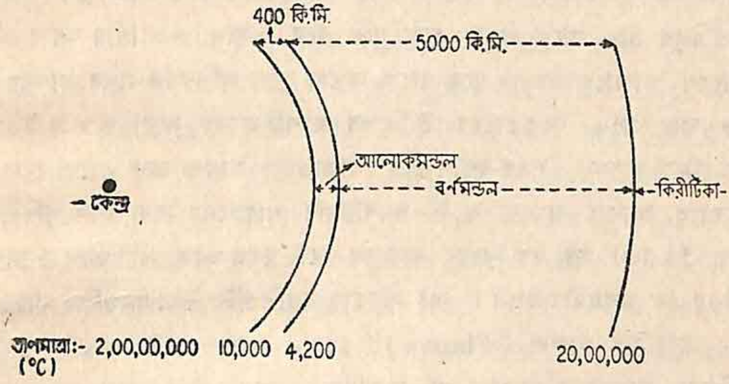
সূর্যকে সহজ কথায় বিপুলায়তন গ্যাসের এক জলন্ত পিণ্ড বলা যায়। একে বিশদভাবে জানার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা সূর্যের দেহকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন।

সূর্যের অত্যুজ্জ্বল গোল থালার মত যে অংশটি সাধারণতঃ আমাদের চোখে পড়ে সেই আলোকমণ্ডল (Photosphere)-কে বলা যায় সূর্যের ত্বক। মোটামুটি গোলাকার ওই ত্বকটিকেই দূর থেকে থালার মত চ্যাপ্টা দেখায়। বিপুলায়তন সূর্যের তুলনায় খুবই পাত্‌লা হলেও এই ত্বকটুকু প্রায় 400 কিলোমিটার পুরু। এর সবচেয়ে ওপরের স্তরের তাপমাত্রা থাকে প্রায় 4200 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড, আর তা বাড়তে বাড়তে সবচেয়ে নীচের স্তরে গিয়ে দাঁড়ায় 10,000 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। আলোকমণ্ডলের ঘনত্ব খুব কম ; পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের স্বাভাবিক ঘনত্বের হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। সূর্যের বিকিরিত শক্তির সবটুকুই মোটামুটি এই আলোকমণ্ডল থেকে আসে। আলোকমণ্ডলের অভ্যন্তরভাগের অবস্থাটা কী সে সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান যেটুকু আছে তা পরোক্ষ। তাই অন্দরমহলের আলোচনা আপাততঃ স্থগিত রেখে আমরা সূর্যের বহির্মণ্ডলের কথায় আসি।

সূর্যগ্রহণের সময় তীব্র উজ্জল আলোকমণ্ডলটি ঢাকা পড়ে ; আমরা দেখতে পাই সূর্যের চারপাশে উজ্জল গোলাপী এক প্রভা—সূর্যের বর্ণমণ্ডল (Chromosphere)। প্রায় পাঁচ হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত এই স্তরের বাইরের স্তর হল কিরীটিকা (Corona), অতি হাল্কা ও পাতলা গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত এক সুদূর-বিস্তৃত স্তর। কিরীটিকার বিস্তার পৃথিবীরও কক্ষপথ ছাড়িয়ে গেছে। অর্থাৎ, আমরা এই মর্ত্তলোকের অধিবাসীরা সূর্যের মধ্যেই বসবাস করছি!

সূর্যের বর্ণমণ্ডল ও কিরীটিকা উভয়ের তুলনায় আলোকমণ্ডল বহুগুণ উজ্জ্বল। আলোকমণ্ডল, ভয়ঙ্কর উত্তপ্ত (তাপমাত্রা 2 কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড) কেন্দ্রের

সবচেয়ে কাছেও বটে। তবুও আলোকমণ্ডলের বহির্সীমানা ছাড়িয়ে যত বাইরের দিকে আসা যায়, তাপমাত্রা ততই বাড়ে এবং কিরীটিকার বহুদূর পর্যন্ত তাপমাত্রা থাকে কুড়ি লক্ষ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড (চিত্র 1)। বর্ণ-মণ্ডল এবং কিরীটিকার এই উচ্চ তাপমাত্রার কারণ আজও এক অজানা রহস্য।



চিত্র—1 : সূর্যের দেহের বিভিন্ন অঞ্চল

কিরীটিকার উচ্চ তাপের ফলে ঐ অঞ্চলের গ্যাসীয় অণুগুলি সৃষ্টি করে প্রোটন, ইলেকট্রন প্রভৃতি কণার স্রোত। এরই কিছু অংশ 300 থেকে 1,000 কিলোমিটার বেগে ছুটে আসে পৃথিবীর দিকে। একে সৌর বায়ু বলে। সূর্যের বুকে মাঝে মাঝে ভয়ঙ্কর সুন্দর কিছু দৃশ্য চোখে পড়ে। এদের মধ্যে আকস্মিক সৌর প্রভা (Solar flare) এবং সৌর ঔজ্জ্বল্য (Solar Prominance) অন্যতম। এ ছাড়াও সূর্যবক্ষে কতকগুলি বিচিত্র ঘটনা বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন। এমনই একটি ঘটনা হল সৌর কলঙ্ক। সূর্যের গায়ে হঠাৎ কালো কালো অনেক জায়গা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এগুলিকে স্থান পরিবর্তন করতে দেখা যায়। বিজ্ঞানীদের মতে এই স্থানগুলির তাপমাত্রা পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের চেয়ে কম। তাই এদের কালো দেখায়। প্রতি এগার বছর অন্তর এই সৌর কলঙ্কের সংখ্যা ও তীব্রতা দুই-ই বেড়ে ওঠে। এরই নাম সৌর কলঙ্ক চক্র। এই সময় সূর্য অস্থির হয়ে ওঠে; তার চৌম্বক প্রক্রিয়া সহসা বেড়ে যায়। পৃথিবীর পরিবেশের উপরেও এদের সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে।

সূর্যের জন্ম :

বিজ্ঞানীদের অনুমান, আজ থেকে প্রায় পাঁচশ কোটি বছর আগে সূর্যের জন্ম হয়েছিল। ছায়াপথ এবং আন্তঃছায়াপথের অসীম অঞ্চল জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে ধূলিকণা, হাইড্রোজেন এবং গ্যাসীয় পদার্থের অত্যন্ত পাতলা মেঘ। এদেরই এক অংশ কোন এক অজানা আভ্যন্তরীন অস্থিরতার ফলে একটি কেন্দ্রবিন্দুর চার পাশে জড়ো হতে শুরু করে। ধুলো ও গ্যাসীয় কণার এই সমাবেশ আকারে যত বড় হতে থাকে, তাদের মধ্যে অভিকর্ষজ বলের আকর্ষণও তত বেড়ে চলে। ফলে মেঘের ওই বিশেষ অংশটি ক্রমেই সংকুচিত আর উত্তপ্ত হয়ে উঠতে থাকে। সমগ্র বস্তুপিণ্ডটির আভ্যন্তরীণ চাপও দ্রুত বেড়ে চলে। এইভাবে বাড়তে বাড়তে সূর্যের সমপরিমাণ আয়তনের মধ্যে যখন পৃথিবীর প্রায় 34,000 গুণ বস্তু ভরের সমাবেশ ঘটে, তখন আভ্যন্তরীণ তাপ ও চাপ পৌঁছয় এক অকল্পনীয় মানে। এই অবস্থায় বস্তুপিণ্ডটির উপাদানগুলি অবস্থান করে আয়নিত প্লাজমা (Plasma)[1] রূপে। সম্ভবতঃ এই জাতীয় একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আমাদের সূর্য জন্মেছিল। জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত সূর্য অচিন্তনীয় বিপুল হারে শক্তি জুগিয়ে চলেছে। প্রতি সেকেণ্ডে বিকীর্ণ এই শক্তির পরিমাণ $3{\cdot}86 \times 10^{26}$ জুল। এই অমিতশক্তির রহস্য বহুদিন যাবং বিজ্ঞানীদের অজানা ছিল।

সৌরশক্তির উৎস :

নক্ষত্রদের শক্তি ভাণ্ডারের রহস্য প্রথম উদ্‌ঘাটন করেন জার্মাণ বিজ্ঞানী হান্‌স্ বেথে (Hans Bethe)। বেথের মতে তাপ পারমাণবিক সংযোজন বিক্রিয়া[2] নক্ষত্রের বুকে যে অনির্বাণ চুল্লী জ্বালিয়ে রেখেছে, তা থেকে প্রতি মুহূর্তে উৎপন্ন হচ্ছে এই বিপুল পরিমাণ শক্তি। আমরা আগেই দেখেছি যে সূর্যের

1. উচ্চ আধানগ্রস্ত ধনাত্মক আয়ন ও মুক্ত ইলেকট্রনের এক অস্বাভাবিক সমাবেশ। অত্যধিক তাপের প্রভাবে সৃষ্ট অকল্পনীয় গতিশীলতার দরুন পরমাণুগুলি পারস্পরিক সংঘর্ষের মাধ্যমে অস্বাভাবিক মাত্রায় আধানগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এই গতিশীলতার ফলেই আবার ধনাত্মক আয়নগুলি বিপরীত তড়িৎবাহী ইলেকট্রনের সঙ্গে পুনর্মিলিত হতে পারে না—সহাবস্থান করে। তবে এদের মধ্যে যে আকর্ষণ বল কাজ করে তা সমস্ত গ্যাসীয় উপাদানকে একত্রিত করে রাখে। অবস্থাটা ঠিক যেন জেলীর মতো। প্লাজমা (Plasma) হল পদার্থের চতুর্থ অবস্থা।

2. অতি উচ্চ তাপে দুই বা ততোধিক লঘু পরমাণু সংযোজিত হয়ে বৃহত্তর পরমাণুর সৃষ্টি।

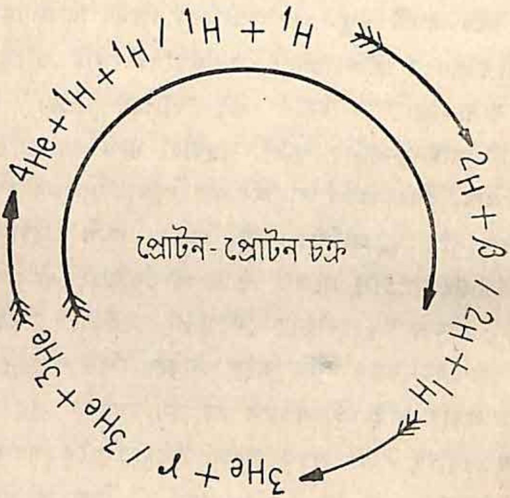
কেন্দ্রে তাপ ও চাপ দুই-ই ভয়ানক বেশি। এই তাপমাত্রা প্রায় দুই কোটি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং চাপের পরিমাণ পৃথিবীর বায়ুচাপের চেয়ে প্রায় চল্লিশ হাজার কোটি গুণ। আরও জেনেছি যে এই উচ্চ তাপে কোনও পদার্থ একমাত্র প্লাজমা দশায় অবস্থান করে। এই অবস্থায় তীব্র গতিশীলতার জন্য কেন্দ্রকগুলি পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এর ফলে অপেক্ষাকৃত হাল্কা মৌলগুলি সংযুক্ত হয়ে সৃষ্টি করে একটি নতুন মৌল। এই ধরনের বিক্রিয়ায় প্রচুর তাপ সৃষ্টি হয়। দেখা গেছে যে বিক্রিয়াকারী কেন্দ্রকগুলির মোট ভরের চেয়ে নতুন কেন্দ্রকের ভর যৎসামান্য কমে যায়। এই "হারিয়ে যাওয়া" ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। আইনস্টাইনের সূত্র[1] অনুযায়ী মাত্র এক গ্রাম ভর থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, হিসাব মতো তা দিয়ে এক হাজারটা একশ ওয়াটের বাল্‌ব তিরিশ বছর এক নাগাড়ে জ্বালিয়ে রাখা যায়। তাপ সংযোজন বিক্রিয়ায় উদ্ভূত এই তাপ বিক্রিয়াকে চালু রাখে। তাই এই বিক্রিয়া একবার শুরু হলে, চলতেই থাকে (বিশেষতঃ লঘু মৌলের ক্ষেত্রে)। এইভাবে বিক্রিয়া নিমেষে ছড়িয়ে প'ড়ে মাধ্যমের তাপ অতি দ্রুত বাড়িয়ে দিতে পারে। এই বর্ধিত তাপ আবার বিক্রিয়ার গতি ভীষণভাবে বাড়িয়ে দেয়। এর ফলে সমস্ত জ্বালানী খুব অল্প সময়ের মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি উদ্গিরণ করে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু নক্ষত্রদের মধ্যে তা হয় না কেন? বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে নক্ষত্রের অভিকর্ষজ বল এই সর্বনাশকে ঠেকিয়ে রেখেছে। বিক্রিয়ায় সৃষ্ট তাপের প্রভাবে নক্ষত্রের আভ্যন্তরীণ তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে গ্যাসীয় পরিমণ্ডল, অভিকর্ষজ আকর্ষণ বলকে উপেক্ষা করে প্রসারিত হতে থাকে। ফলে তাপমাত্রা যায় কমে, আর স্বভাবতই কমে যায় বিক্রিয়ার তেজ। এইভাবে বিক্রিয়া খানিকটা ঝিমিয়ে পড়লে অভিকর্ষজ বল প্রবলতর হওয়ায় নক্ষত্রের আয়তনের সংকোচন ঘটে। সঙ্গে সঙ্গে তাপমাত্রা যায় বেড়ে। ঝিমিয়ে পড়া বিক্রিয়া আবার আগের মতোই তেজীয়ান হয়ে ওঠে।

সূর্যে যে তাপ পারমাণবিক সংযোজন প্রক্রিয়াটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, তাকে প্রোটন—প্রোটন শৃঙ্খল বিক্রিয়া (চিত্র—2) বা "হাইড্রোজেন

---

1. হারিয়ে যাওয়া ভর m ও আলোর গতিবেগ c হলে উদ্ভূত শক্তির পরিমাণ হয়, $E=m\times c^2$. m সামান্য হলেও c-এর মান অত্যন্ত বেশি (3 লক্ষ কিলোমিটার প্রতি সেকেণ্ডে বলে E হয় খুব বড়।

দহন" বলে। এর মাধ্যমে চারটি হাইড্রোজেন কেন্দ্রক (প্রোটন) সংযোজিত হয়ে উৎপন্ন করে নতুন মৌল হিলিয়াম। এই বিক্রিয়ার ফলে প্রতি সেকেণ্ডে সূর্যদেহের 5640 লক্ষ টন হাইড্রোজেন 5600 লক্ষ টন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হচ্ছে। অর্থাৎ সূর্যদেহ থেকে প্রতি সেকেণ্ডে প্রায় 40 লক্ষ টন ভর শক্তিরূপে আত্মপ্রকাশ করছে। কী অপরিসীম এই শক্তি !



চিত্র -2 : সূর্যের অমিত তেজের উৎস হল কেন্দ্রক সংযোজন বিক্রিয়া। এটি একটি শৃঙ্খল বিক্রিয়া—চক্রাকারে চলে। সূর্যে যে চক্রটি ক্রিয়া করছে তার নাম প্রোটন—প্রোটন চক্র।

প্রশ্ন উঠতে পারে যে সূর্যে হাইড্রোজেন ছাড়াও তো অন্যান্য মৌল আছে, তাদের মধ্যে কি তাপ সংযোজন বিক্রিয়া হয় না ? এর উত্তরে বলা যায় যে, এমন বিক্রিয়া ঘটতে পারে। তবে সূর্যে আপাতত তার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। হাইড্রোজেন লঘুতম মৌল হওয়ায় অত্যন্ত গতিশীল, তাছাড়া এর কেন্দ্রক অর্থাৎ প্রোটনের আধান মাত্র এক একক হওয়ায় সংযোজী কেন্দ্রকদের মধ্যে পারস্পরিক বিকর্ষণ বল অনেক কম। তাই প্রোটন-প্রোটন সংযোজন বিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। ভারী মৌলের কেন্দ্রে আধান বেশি। তাই সংঘর্ষের সময় উচ্চ সমজাতীয় আধানের দরুণ বিকর্ষিত হয়ে ঠিকরে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। লঘুতম যে হাইড্রোজেন তার ক্ষেত্রেও বিক্রিয়াটি খুব সহজ নয়। এক একটি প্রোটনকে এই মিলনের অপেক্ষায় একশ কোটি বছর কাটাতে হতে পারে।

প্রচণ্ড ভরক্ষয় সত্ত্বেও এই পাঁচশ কোটি বছর ধরে সূর্য তার মোট হাইড্রোজেন জ্বালানীর মাত্র এক শতাংশ খুইয়েছে। সহজেই অনুমান করা যায় যে এর হাইড্রোজেনের ভাণ্ডার কী বিশাল। ফলে আজ থেকে কোটি কোটি বছর পরেও সে একইভাবে আমাদের শক্তি জুগিয়ে যাবে, আশা করা যায়।

সূর্যের মৃত্যু :

সূর্য বর্তমানে এক সাম্যাবস্থায় আছে, যেখানে এর দীপ্তি এবং শক্তি উৎপাদন পরস্পরের সঙ্গে তাল রেখে চলেছে এবং আলো, তাপ বিকিরণের হার দীর্ঘদিন যাবৎ মোটামুটি একই আছে। ফলে সৌর জগতে প্রাণ সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। কিন্তু হাইড্রোজেনের পরিমাণ যতই বেশি হোক না, তারও শেষ আছে। শেষের সে দিনের কথাও বিজ্ঞানীরা চিন্তা করেছেন।

কালক্রমে হাইড্রোজেন যখন ফুরিয়ে আসবে, তখন তাপ সংযোজন বিক্রিয়া শুরু হবে হিলিয়াম ও অন্যান্য ভারী মৌলদের মধ্যে। সূর্যের রাসায়নিক সংগঠন পরিবর্তিত হবে। ফলে সূর্যের আয়তন বাড়বে ; বাড়বে তার দীপ্তি। বর্তমান 'পীত-বামন' দশা থেকে তার রূপান্তর হবে 'লোহিত দৈত্য'রূপে। বিজ্ঞানীদের অনুমান, এই রূপান্তর ঘটতে কেটে যাবে কয়েকশ কোটি বছর। শেষে যখন তাপ কেন্দ্রীন বিক্রিয়ার চুল্লীতে দেওয়ার মত আর কোন জ্বালানীই থাকবে না, তখন প্রবল অভিকর্ষজ আকর্ষণ বলের প্রভাবে সূর্য পৌঁছবে তার জীবনের শেষ পর্যায়ে। তার পরিণতি ঘটবে ছোট এক তারা—'শ্বেত বামন'রূপে, যার আয়তন হবে সূর্যের বর্তমান আয়তনের প্রায় একশ ভাগের এক ভাগ। শ্বেতবামন দশায় সূর্যের যে আভ্যন্তরীণ তাপ ও দীপ্তি থাকবে কালক্রমে তাও কমে যাবে। শেষ পর্যায়ে সূর্য পরিণত হবে দীপ্তিহীন, ছোট, অত্যধিক ভারী ও মৃত (degenerate) বস্তু পিণ্ডে, অর্থাৎ 'কৃষ্ণ বামন'রূপে।

সূর্যের মত এক মহান অভিনায়কের এই পরিণতি অনেকে মেনে নিতে পারেননি। তাঁরা মনে করেন যে সূর্যের ভবিষ্যৎ জীবন অন্য এক খাতেও বইতে পারে। হাইড্রোজেন ফুরিয়ে আসার সময় সমস্ত সূর্যটাই এক অতি প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ফেটে পড়তে পারে এই মহাবিশ্বের মহা অঙ্গনে। সেই ধূলিকণা এবং অসীম মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা আরও বস্তুকণাদের নিয়ে হয়তো জন্ম নেবে এক নতুন নক্ষত্র। সূর্যের ক্ষেত্রে ঠিক এমনটা ঘটবে কিনা তা নিয়ে মতভেদ

থাকলেও অন্যান্য অনেক নক্ষত্রের জন্ম-মৃত্যুকে ঘিরে এই খেলা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে। এমনকি সূর্যের দেহেও যে পিতৃপুরুষ নক্ষত্রদের দেহ-অস্থি এসে মিশেছে, সে কথা বিজ্ঞানীরা স্বীকার করেন।

সূর্য কিরণের প্রকৃতি ও পরিণতি :

প্রায় দশ কোটি মাইল পথ মাত্র আট-নয় মিনিটে অতিক্রম করে আলোকমণ্ডল থেকে সূর্যের কিরণ পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়। এই পথের অধিকাংশই ফাঁকা। কোনও মাধ্যম নেই। ফলে পরিবহণ ও পরিচলন পদ্ধতিতে এই পথ অতিক্রম করা সম্ভব নয়। সূর্যের কিরণ তড়িৎ-চুম্বক তরঙ্গরূপে বিকিরণ পদ্ধতিতে এসে পৌঁছয়—আমাদের জন্যে তাপ আর আলো, জীবন আর আনন্দের ডালি নিয়ে। এই কিরণে থাকে বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের বিভিন্ন শক্তির আলো। থাকে মাঝারী শক্তি সম্পন্ন নানান দৃশ্য আলো, যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 400-750 ন্যানোমিটার[1]। এই দৃশ্য আলো আবার রামধনুতে দেখা সাতটি রঙের মিশ্রণ—বেগুনী, নীল, আসমানী, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল। এ ছাড়া থাকে প্রচুর পরিমাণে শক্তিশালী অতি বেগুনী (**Ultraviolet**) রশ্মি। এদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 400 ন্যানোমিটারের চেয়েও কম। এছাড়া রয়েছে নিম্নশক্তিযুক্ত কিছু অবলোহিত (**Infrared**) রশ্মি, যাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 750 ন্যানোমিটারের চেয়ে বেশি।

সূর্য থেকে বছরে প্রায় $1{\cdot}2\times10^{24}$ জুল পরিমাণ শক্তি কোটি কোটি মাইল পথ অতিক্রম করে পৃথিবীতে এসে পড়ে। এই আপতিত শক্তির শতকরা সাতচল্লিশ ভাগ মাত্র (অর্থাৎ $5{\cdot}6\times10^{23}$ জুল) ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছয়। শতকরা 13 ভাগ কিরণ বায়ুমণ্ডলে শোষিত হয় আর বাকিটা (শতকরা 34 ভাগ) বায়ুমণ্ডলের মেঘপুঞ্জ, ধূলিকণা ও গ্যাস অণু দ্বারা বিচ্ছুরিত ও প্রতিফলিত হয়ে ফিরে যায় মহাশূন্যে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে। আবার এই 34 শতাংশের মধ্যে 2 শতাংশ ভূ-পৃষ্ঠ থেকে, 7 শতাংশ বায়ুর গ্যাসীয় অণু ও ধূলিকণা থেকে এবং 25 শতাংশ মেঘপুঞ্জ থেকে প্রতিফলিত ও বিচ্ছুরিত হয়ে থাকে।

---

1. এক মিটারের একশ কোটি ভাগের এক ভাগ

বায়ুমণ্ডলে বিচ্ছুরক কণাদের ব্যাসার্ধ আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের দশভাগ বা তার কম হলে যে ধরণের বিচ্ছুরণ হয় তাকে র‍্যালের (**Ralleigh**) বিচ্ছুরণ বলে। এই ধরণের বিচ্ছুরণের তীব্রতা, তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত কমতে থাকে। ফলে দেখা যায় যে, দৃশ্য আলোকের মধ্যে যার তরঙ্গ দৈর্ঘ্য সব চাইতে কম, সেই নীল আলোরই বিচ্ছুরণ হয় সবচেয়ে বেশি। মেঘমুক্ত আকাশ এই বিচ্ছুরিত আলোরই রঙে নীল। আবার অস্তগামী সূর্যের আলোর লাল রঙও এরই ফল। গোধূলি বেলার সূর্য দিগন্তে ঢলে পড়ায় তার নীল রঙের আলো প্রায় সবটুকুই অন্যদিকে বিচ্ছুরিত হয়ে যায়; আমাদের চোখে সরাসরি এসে পৌছয় লাল আলো। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অধিক বলে লাল আলোর বিচ্ছুরণ প্রায় ঘটেই না। বিচ্ছুরক কণাদের ব্যাসার্ধ খুব বেশি হলে (আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের পঁচিশ গুণ) তাদের আর কোনও বাছ-বিচার থাকে না। লাল, নীল সব আলোকেই তারা ছিটকে দেয় এদিক ওদিক। তাই ধোঁয়াশা বা কুয়াশার মধ্য দিয়ে আকাশ সাদা বা ঘোলাটে দেখায়।

আবহাওয়া মণ্ডলে সৌর কিরণের শোষণ ঘটে প্রধানতঃ দুটি জিনিষে—জলীয় বাষ্প ও ওজোন গ্যাস। ওজোন গ্যাসের স্তর থাকে বায়ুমণ্ডলের উপরের দিকে। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় 40 কিলোমিটার উপরেই এই স্তর সূর্য কিরণের অতিবেগুনী অংশের অধিকাংশ সঞ্চয়ই শুষে নেয়। তাই অতিবেগুনী রশ্মির কোনও ক্ষতিকর প্রভাব প্রকৃতিতে পড়ে না। বায়ুমণ্ডলের নীচের স্তরে অর্থাৎ পৃথিবীতে প্রবেশের দ্বিতীয় দরজায় পাহারাদার থাকে জলীয় বাষ্প। সেও কিরণের বেশ কিছু অংশই শোষণ করে। মেঘ কিন্তু সূর্য কিরণ শোষণ করে না। তবে সূর্য কিরণের বেশ কিছু অংশকে মেঘ ফেরৎ পাঠায় বিচ্ছুরণ ও প্রতিফলন পদ্ধতিতে। সূর্যকিরণ শোষণ করেনা বলেই সর্বদা সূর্যের কিরণের সংসর্গে থেকেও মেঘ বাষ্পীভূত হয়ে যায় না।

এবার প্রতিফলনের কথায় আসা যাক। সূর্যরশ্মি কে কতটা প্রতিফলিত করবে তা নির্ভর করে প্রতিফলকের চরিত্রের উপর। আপতিত বিকিরণের যত ভগ্নাংশকে প্রতিফলক প্রতিফলিত করে তাকে বলে ঐ প্রতিফলকের প্রতিফলনাঙ্ক (**Albedo**)। পরপৃষ্ঠার তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে যে প্রাকৃতিক পরিমণ্ডলের বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে মেঘ থেকেই সব চেয়ে বেশি সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে থাকে।

প্রতিফলক বস্তু	প্রতিফলনাঙ্ক	প্রতিফলিত রশ্মির শতকরা পরিমাণ
গাছপালা	0·2	20
হাল্কা রঙের মাটি	0·3	30
গাঢ় রঙের মাটি	0·1	10
জল	0·1	10
মেঘ	0·5—0·9	50—90

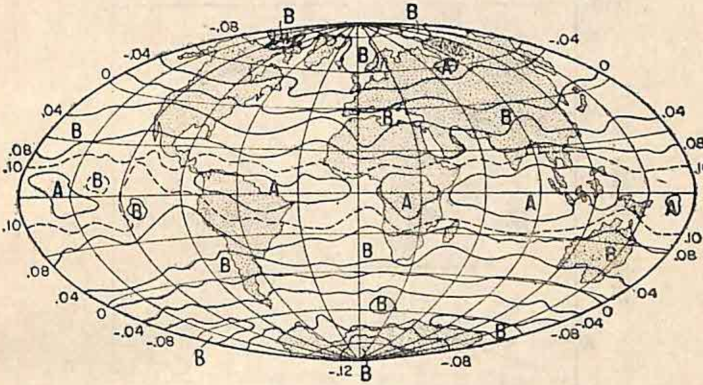
এতসব বাধা ডিঙিয়ে যেটুকু শক্তি ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌছয় তার বেশ কিছুটা ব্যয় হয় বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাকে ধরে রাখতে। এক ছোট ভগ্নাংশ চালু রাখে পৃথিবীর জলচক্রকে—নদী ও সাগরের জল বাষ্পীভূত হয়, সৃষ্টি হয় মেঘের, শেষে আবার বৃষ্টি হয়ে মাটিতে ফিরে আসে। স্বল্প এক ভাগ বায়ু চলাচল, সমুদ্র ও নদীর জলস্রোতকে সচল রাখে। আরও স্বল্পতর এক অংশ ব্যয় হয় গাছ-পালার খাদ্য প্রস্তুতিতে জ্বালানী হিসেবে (সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া)। এই সালোক-সংশ্লেষই পৃথিবীতে জীবন সৃষ্টি ও তার পরিপোষণে প্রধানতম কৃতিত্বের দাবীদার।

সৌরশক্তি ও আবহাওয়া :

কোন জায়গা বছরে কতক্ষণ আর কতটুকু রোদ্দুর পায় তার উপরে নির্ভর করে সেই অঞ্চলের গড় তাপমাত্রা। শুধু তাই নয়, নির্ভর করে ঐ এলাকার বায়ুস্রোত, সমুদ্রস্রোত, বৃষ্টিপাত। কাজেই বলা বাহুল্য যে আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে সৌরশক্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করে। আবার সৌর বিকিরণের তীব্রতা (Insolation) নির্ভর করে ঐ স্থানের উচ্চতা ও অক্ষাংশের উপর (চিত্র 3)।

সৌর-বিকিরণের যে অংশটুকু ভূপৃষ্ঠে শোষিত হয় সেই পরিমাণ শক্তিই পুনরায় ভূপৃষ্ঠ থেকে তাপরূপে মুক্ত হয়, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ তরঙ্গের আকারে (অবলোহিত তরঙ্গরূপে), যা সহজেই বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করতে পারে। কিন্তু আপতিত রশ্মি ও বায়ুমণ্ডলে প্রতিফলিত রশ্মি ক্ষুদ্র তরঙ্গের আকারে থাকে বলে বায়ুমণ্ডলকে উত্তপ্ত করতে পারে না। আর এই কারণে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে গেলে তাপমাত্রা ক্রমাগত কমতে থাকে। দেখা গেছে যে প্রতি এক কিলোমিটার উচ্চতায় 6·4 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা কমে যায়।

তাই দিল্লীর চেয়ে সিমলা, এবং শিলিগুড়ির চেয়ে দার্জিলিং শীতল হয় এবং হিমালয়ের সুউচ্চ চূড়াগুলি চিরকাল তুষারাবৃত থাকে। আবার অক্ষাংশের

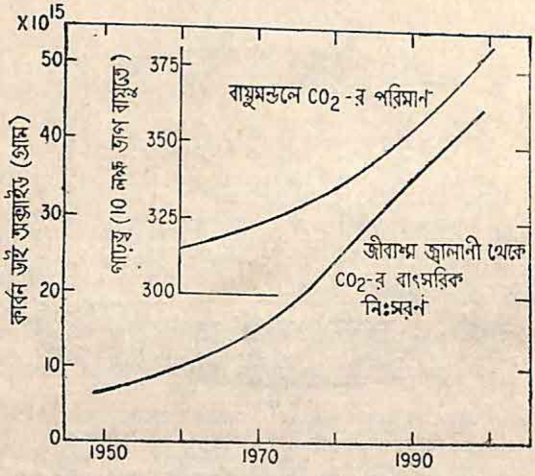


চিত্র—3 : ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানে সৌরশক্তির তীব্রতা : A-চিহ্নিত স্থানে সৌররশ্মির তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং B-চিহ্নিত স্থানে অপেক্ষাকৃত কম

উপর সূর্যরশ্মির আপতন কোণ ও দিবা-রাত্রির স্থায়িত্বকাল নির্ভর করে। নিরক্ষ-রেখা থেকে যতই উচ্চ অক্ষাংশে যাওয়া যায়, সূর্যরশ্মি তত বেশি তির্যকভাবে পড়ে। লম্বভাবে আপতিত রশ্মির চেয়ে তির্যক রশ্মি দীর্ঘতর বায়ুস্তর ভেদ করে আসে ও অপেক্ষাকৃত বেশি জায়গা জুড়ে পড়ে। ফলে এর তীব্রতা কমে। আবার আমরা জানি যে, কোনও স্থানে বছরের বিভিন্ন সময়ে দিবা-রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। কোনও স্থানে দিন বড় ও রাত ছোট হলে দিনের গৃহীত তাপ রাতের বর্জিত তাপের চেয়ে বেশী হয়। ফলে ঐ স্থানের উষ্ণতা যায় বেড়ে। আবার রাত অপেক্ষাকৃত বড় হলে দিনের সঞ্চিত তাপের চেয়ে রাতে বিকীর্ণ তাপের পরিমাণ বেশি হয় বলে তাপমাত্রা কমে যায়। বছরের বিভিন্ন সময়ে এই দিবা-রাত্রির তারতম্য ও সূর্যকিরণের আপতন কোণের পার্থক্য থেকেই আসে ঋতু পরিবর্তন।

আবহাওয়ামণ্ডল গঠন ও নিয়ন্ত্রণে সৌর শক্তির এ সব ভূমিকা ছাড়াও আরও একটি বিষয় নিয়ে বিজ্ঞানীরা আজকাল খুব আলোচনা করেন। তা হল আবহাওয়ার ওপর কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসের প্রভাব। জীবাশ্ম জ্বালানীর ক্রমবর্ধমান ব্যবহারের ফলে বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ দিন দিন বেড়ে

চলেছে (চিত্র 4)। আর দেখা গেছে যে এর ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রাও বাড়ছে। কারণ হিসেবে বিজ্ঞানীরা 'গ্রীনহাউজ এফেক্টের' (Green house

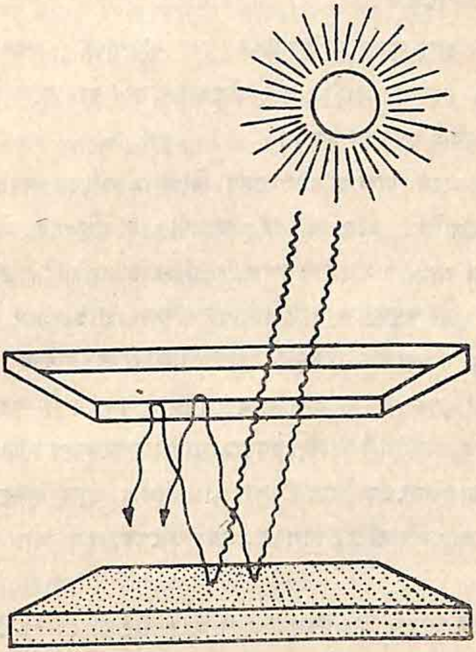


চিত্র—4 : বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বাড়ছে

effect) কথা বলছেন। গ্রীনহাউজ এফেক্ট ব্যাপারটা সহজেই বুঝতে পারবেন যারা অর্কিডের কাঁচের ঘর দেখেছেন। কাঁচের ঘরের ভেতর দিয়ে সূর্যরশ্মি দিব্যি ঢুকতে পারে অপেক্ষাকৃত কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্য থাকে বলে। ভেতরে এসে এই রশ্মির অনেকটাই রূপান্তরিত হয় দীর্ঘতর তাপ রশ্মিতে। এই তাপ রশ্মিকে কাঁচ আটকে দেয়। এইভাবে অর্কিডের গ্রীনহাউজটির ভেতরটা রাতেও বেশ গরম থাকে। তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয় না। দেখা গেছে যে বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসও অনেকাংশে কাঁচের দেওয়ালের মতো ব্যবহার করে। এরই দরুণ আমাদের পৃথিবী যে তাপ বিকিরণ করছে তা সবটা মহাকাশে বেরিয়ে যেতে পারে না। ফলে আমরা মহাজাগতিক শীতলতার হাত থেকে রক্ষা পাই। যে সব গ্রহ বা উপগ্রহে আবহাওয়ামণ্ডল নেই (যেমন চাঁদ), সেখানে রাতের বেলা তাপমাত্রা পরম শূন্যের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যবহার ক্রমাগত বাড়ার দরুণ CO_2 গ্যাসের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেলে, বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রাও যাবে বেড়ে।

আবহাওয়া প্রসঙ্গে সৌরশক্তির আরও একটি ভূমিকার কথা অবশ্যই স্বীকার হয়। বিজ্ঞানীরা বলেন যে, সৃষ্টির আদিকালে পৃথিবীর আবহাওয়ামণ্ডলে

মুক্ত অক্সিজেন গ্যাসের কোনও অস্তিত্ব ছিল না; যেমন ছিল না উর্ধ্বাকাশে ওজোন গ্যাসের স্তর। ক্রমে শৈবাল জাতীয় অতিক্ষুদ্র কার্বন ডাই-অক্সাইড ভোজী প্রাণের আবির্ভাব হল। এরাই হল উদ্ভিদকুলের আদি পুরুষ। সূর্য



চিত্র—5: গ্রীণহাউজ এফেক্ট—সূর্য থেকে আসা ক্ষুদ্রতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের রশ্মি কাঁচ ভেদ করে ঢুকতে পারে। এই রশ্মি মাটিতে প্রতিফলিত হওয়ার পর বৃহত্তর তরঙ্গের তাপ রশ্মিতে পরিণত হয়। এই বড় তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের রশ্মি আর কাঁচ ভেদ করে ফিরে যেতে পারে না।

কিরণের দৃশ্য আলোর প্রভাবে এদের মধ্যে প্রথম শুরু হল সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া—যার ফলে বাতাসের কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জলের সংশ্লেষণে তৈরী হল উদ্ভিদের খাদ্য। সেই সঙ্গে বেরিয়ে আসতে শুরু করল মুক্ত অক্সিজেন। সূর্যের অতিবেগুনী রশ্মি তখন বিনা বাধায় পৃথিবীতে এসে পৌছত। এর প্রভাবে জল বিশ্লিষ্ট হয়েও তৈরী হল কিছু অক্সিজেন। আবার এই অতিবেগুনী রশ্মিরই প্রভাবে এই অক্সিজেন আর শৈবালদের তৈরী করা অক্সিজেন থেকে সৃষ্টি হল ওজোন গ্যাস। পরে এই ওজোনেরই স্তর জীব দেহের পক্ষে মারাত্মক অতিবেগুনী

রশ্মির হাত থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করে আসছে। তাই সূর্যের জ্বালা থেকে বাঁচার এই যে রক্ষা কবচ তাও সূর্যের কল্যাণে পাওয়া।

সৌরশক্তির রূপভেদ :

প্রকৃতিজাত প্রায় সমস্ত শক্তির উৎসই হল সৌরশক্তি। তবে এর ব্যতিক্রমও রয়েছে ; যেমন, জোয়ার-ভাটা থেকে উদ্ভূত শক্তি (যার মূলে রয়েছে চন্দ্র-সূর্য-পৃথিবীর পারস্পরিক আকর্ষণ বল)।

প্রথমেই তাকানো যাক জীব জগতের দিকে। জীবের সমস্ত জীবনীশক্তির উৎস হল সৌরশক্তি। এর আগেই আমরা দেখেছি যে, উদ্ভিদকুল সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় তাদের খাদ্য কার্বোহাইড্রেড তৈরী করে। এইভাবে আপতিত সৌরশক্তির প্রায় এক শতাংশ উদ্ভিদ দেহে বন্দী হচ্ছে। আবার তৃণভুক প্রাণীরা উদ্ভিদের সঞ্চিত এই শক্তির প্রায় শতকরা 10 ভাগকে রূপান্তরিত করে প্রাণী দেহে বন্দী করছে। আবার মানুষ বা অন্যান্য মাংসাশী প্রাণী, তৃণভুক প্রাণীর দেহকোষে সঞ্চিত শক্তির প্রায় শতকরা 10 ভাগ সংগ্রহ করতে পারে। অর্থাৎ খাদ্য শৃঙ্খলের মধ্য দিয়ে মানুষ আপতিত সৌরশক্তির দশ হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র আহরণ করে থাকে।

সংগৃহীত এই শক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ ব্যয় হয় বিভিন্ন জৈবিক ক্রিয়ায়। বাকিটা সঞ্চিত থাকে জীবদেহে। ঝড়-ঝঞ্ঝা, ভূমিকম্প, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগে এই সব জীবদেহ মাটিতে চাপা পড়তে পারে। এই অবস্থায় লক্ষ লক্ষ বছর ধরে ঐসব জৈব পদার্থগুলির মধ্যে অতি ধীরে ধীরে চলতে থাকে রাসায়নিক পরিবর্তন। এর ফলে সৃষ্টি হয় কয়লা, পেট্রোলিয়াম, প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি। এরা জীবাশ্ম জ্বালানী নামে পরিচিত। এই জীবাশ্ম জ্বালানীর উপর অনেকাংশে নির্ভর করছে আজকের সভ্যতা। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, আধুনিক সভ্যতার ধারক জীবাশ্ম শক্তি হল আসলে বহুদিনের সঞ্চিত সৌরশক্তি।

এর পর আসা যাক বায়ু শক্তিতে। আমরা জানি যে, বায়ুপ্রবাহের কারণ হল বিভিন্ন স্থানে বায়ু চাপের তারতম্য—বায়ু উচ্চ চাপ থেকে নিম্ন চাপযুক্ত অঞ্চলের দিকে ধেয়ে যায়। বায়ু চাপের এই পার্থক্য ঘটে আবার ভূ-পৃষ্ঠের

বিভিন্ন স্থানে উষ্ণতার তারতম্যের জন্যে। কেননা আমরা দেখেছি সূর্যরশ্মির তীব্রতা ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র সমান নয়। এইভাবে সৃষ্টি হয় নিয়ত বায়ু (Permanent wind)—যেমন, আয়ন বায়ু (Trade wind), পশ্চিমাবায়ু (*W*esterlies) ও মেরু বায়ু (Polar wind)। এছাড়া আছে সাময়িক বায়ু (Periodical wind)—যেমন, স্থলবায়ু, সমুদ্রবায়ু, মৌসুমীবায়ু ইত্যাদি, যেগুলি সৃষ্টির কারণ দিনের বিভিন্ন সময়ে ও বছরের বিভিন্ন ঋতুতে উষ্ণতা ও চাপের পার্থক্য। কাজেই, বায়ুশক্তি প্রকৃত পক্ষে সৌরশক্তি ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মিলিত ফল। মধ্যযুগে বিশেষতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে শিল্প বিপ্লবের আগে পর্যন্ত এই বায়ু শক্তিই ছিল বড় বড় শিল্পে যান্ত্রিক শক্তির প্রধান উৎস। কিন্তু এতে প্রধান অসুবিধা হল এই যে, এটি সর্বদাই পরিবর্তনশীল।

জেম্‌স্ জীন্‌স্ (James Jeans) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন যে কোনও এক কালে একটি বিরাট নক্ষত্র সূর্যের খুব কাছ দিয়ে তীব্রবেগে ছুটে যাওয়ার সময় তার প্রচণ্ড আকর্ষণে সূর্যের কিছু অংশ সূর্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে সূর্যের চারদিকে ঘুরতে থাকে ও পরে খণ্ড খণ্ড হয়ে যায়। এমনই একটি খণ্ড থেকে আমাদের পৃথিবী সৃষ্টি হয়েছে। এই মতবাদ যদি সত্য হয় তবে পৃথিবী সূর্যেরই একটি বিচ্ছিন্ন অংশ। তাহলে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগের ভূ-তাপীয় শক্তি (Geothermal energy) আসলে সৌরশক্তিরই একটি রূপ। তবে অনেকে এই ভূ-তাপীয় শক্তিকে সৌরশক্তির একটি রূপ বলে স্বীকৃতি দিতে নারাজ। কেননা পৃথিবী সূর্যের বিচ্ছিন্ন অংশ—এই তত্ত্বে তাঁরা বিশ্বাসী নন।

আবার নদনদী প্রভৃতি জলধারার অন্তর্নিহিত শক্তি হল সৌরশক্তি ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মিলিত ফল। সৌরশক্তি নদ-নদী ও সমুদ্র জলকে বাষ্পীভূত করে জলীয় বাষ্প সৃষ্টি করছে। এই জলীয় বাষ্প আবার বৃষ্টি বা তুষার হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে এসে নদ-নদী বা হিমবাহের রূপ নিয়ে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে মিলিত হচ্ছে। নদ-নদীর এই স্রোত থেকে উৎপন্ন করা হচ্ছে জল-বিদ্যুৎ (Hydro-electricity)।

জল-বিদ্যুতের মত তাপ-বিদ্যুতেও (Thermal electricity) সৌরশক্তির অবদান কম নয়, এ বিষয়ে আগেও আলোচনা করা হয়েছে। এক্ষেত্রে জ্বালানী হল কয়লা কিংবা তেল। আবার আমরা জানি জ্বালানী তেল অথবা কয়লায় সঞ্চিত শক্তি হল সৌরশক্তির রূপভেদ।

সমুদ্র জলের উষ্ণতা ও লবণাক্ততার পার্থক্য ইত্যাদি থেকেও বর্তমানে বিদ্যুৎ তৈরীর চেষ্টা করা হচ্ছে। এ সবেরও কারণ হল সৌরশক্তি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে প্রকৃতিতে শক্তির যে বহুমুখী প্রবাহ চলেছে তার উৎস প্রধানতঃ একটিই—তা হল সৌরশক্তি।

জীবদেহে সৌরশক্তির প্রভাব ঃ

মেঘলা দিনে আমরা বিষণ্ণ বোধ করি। রৌদ্রোজ্জ্বল মেঘমুক্ত আকাশ আমাদের দেহমনে নতুন উদ্যম এনে দেয়। ভোরের প্রথম আলো যেন, পশু-পাখীর জীয়নকাঠি—এর স্পর্শমাত্র জেগে ওঠে জীবজগৎ। প্রতিটি প্রভাত আমাদের কাছে নতুন আশার প্রতীক, জীবনের প্রেরণা। মরণোন্মুখ রোগীর নিকটজন যখন হতাশ হয়ে ভাবতে থাকে 'এ কাল রাত্রি বুঝিবা আর পোহাবে না', তখন ভোরের প্রথম আলো তাদের মনে নতুন করে বুক বাঁধার প্রেরণা ও শক্তি জোগায়। দৈনন্দিন জীবনে এই সব মানসিক প্রতিক্রিয়ার পেছনে রয়েছে জীবদেহের স্নায়ুতন্ত্রের উপর সূর্যালোকের প্রত্যক্ষ প্রভাব।

এছাড়া জীবদেহের অন্যান্য অংশেও সূর্য কিরণের রাসায়নিক প্রভাব অতি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা জানি যে সূর্যের আলোর অতিবেগুনি রশ্মি দেহের পক্ষে খুবই ক্ষতিকারক। এছাড়া রয়েছে গামা রশ্মি ও ক্ষুদ্রতরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মহাজাগতিক রশ্মি (**Cosmic Radiation**)। এসবের বেশির ভাগই ওজোন স্তরে শোষিত হয়। স্বল্প যে অংশটুকু ভূ-পৃষ্ঠে এসে পৌঁছয় তার যথেষ্ট উপকারিতা রয়েছে। রোগনিরাময়ে, জীবাণুনাশক হিসেবে ও দেহের প্রয়োজনীয় ভিটামিন গঠনে এদের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকালে বিশ্বাস করা হতো সূর্যরশ্মি কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের ক্ষমতা রাখে। এ বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা না গেলেও বিভিন্ন চর্মরোগ যে সূর্যের আলোয় সারে সে ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ হয়েছেন। এছাড়াও পর্যাপ্ত সূর্যের আলোর অভাবে রক্তাল্পতা, ফোঁড়া, গলগণ্ড, এমনকি এক ধরণের যক্ষ্মা পর্যন্ত হতে পারে। আমাদের দেশে শিশুদের তেল মাখিয়ে সকালের রোদে শুইয়ে রাখা হয়। সূর্যালোকে ব্যাক্‌টিরিয়া ও ছত্রাক মারা পড়ে ও ত্বক নীরোগ থাকে। বিদেশেও 'সান্‌বাথ' খুবই প্রচলিত। এছাড়া অতিবেগুনী রশ্মি ত্বকের 'এর্‌গোস্টেরল' নামক জৈব পদার্থকে রূপান্তরিত করে ক্যাল্‌সিফেরল বা ভিটামিন-ডিতে। ত্বকে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি

থাকার প্রয়োজন হয়। এর অভাবে হাড়ের ক্যালসিয়াম ধারণ-ক্ষমতা কমে যায়। আর ক্যালসিয়ামের অভাবে দেখা দেয় রিকেট রোগ।

মূলতঃ সূর্যের প্রভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের মানুষের গায়ের রঙ বিভিন্ন হয়। দেখা গেছে যে বিষুবরেখার কাছাকাছি অঞ্চলে সূর্যরশ্মির তীব্রতা খুব বেশি বলে ঐ সব স্থানের মানুষেরা হয় কৃষ্ণ বর্ণের। এর কারণ হল এসব ক্ষেত্রে দেহ-ত্বকে অধিক পরিমাণে 'মেলানিন' নামক রঞ্জক কণার উপস্থিতি। ঐ মেলানিন অতিবেগুনী রশ্মিকে শোষণ করে দেহত্বক রক্ষা করে। দেহত্বকের গভীরে 'এপিডার্মিস্' স্তরে মেলানোসাইট থেকে এই রঞ্জক কণার উৎপত্তি। অতিবেগুনী রশ্মি দেহত্বক ভেদ করে এপিডার্মিস্ স্তরে প্রবেশ করে মেলানোসাইটের সঙ্গে জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সৃষ্টি করে এই মেলানিন। ভূ-পৃষ্ঠের যে সব জায়গার সূর্যের আলোর তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে দেহত্বকে মেলানিনের পরিমাণও কম থাকে। রঙ হয় ফর্সা। অতিরিক্ত অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে ত্বকে প্রোটিন নির্মিত যৌগকলা ও স্থিতিস্থাপক কলার যথেষ্ট ক্ষতি হয়; অতিরিক্ত সূর্যালোকের প্রভাবে দেহের উন্মুক্ত স্থানে ক্যান্সার হওয়া সম্ভব —এমন অভিমতও ইদানীং কেউ কেউ প্রকাশ করেছেন। দেহত্বকের ডি. এন.-এ.[1] অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে ক্যান্সারের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে।

জীবদেহের উপর সূর্যরশ্মির প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা প্রায় হয় নি বলা যেতে পারে। তবে দেখা গেছে যে আমাদের রক্তস্রোত সূর্যকিরণের শক্তিকে দেহের এক অংশ থেকে অন্য অংশে বহন করে নিয়ে যেতে পারে। এই শক্তি পরিবহণের প্রকৃত ক্রিয়াকৌশল আজও সঠিকভাবে জানা যায় নি।

1. ডি-অক্সিরাইবোনিউক্লিক অ্যাসিড।

সভ্যতা ও শক্তি সংকট

Before pollution chokes civilisation to a halt, the fuel that produces it will probably be gone —*D. S. Halacy*

মানব সভ্যতায় শক্তি :

জীব আর জড় পদার্থের মধ্যে এক বিশেষ পার্থক্য হল এই যে, জীবের অস্তিত্বের জন্য শক্তির নিরবচ্ছিন্ন জোগান চাই। জীবেরা খাদ্য থেকে এই শক্তি সংগ্রহ করে। উদ্ভিদ ক্লোরোফিলের সাহায্যে সৌরশক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত ক'রে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও জল থেকে তার খাদ্য কার্বোহাইড্রেড তৈরী করে নেয় (সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া)। প্রাণীরা তাদের খাদ্য সংগ্রহ করে হয় উদ্ভিদ, নয়তো অন্যান্য প্রাণীর দেহ থেকে। বিপাক ক্রিয়ায় জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে খাদ্য ভেঙ্গে গিয়ে সরলীকৃত হয়। এই সরলীকৃত খাদ্যের দহনে (অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া) সৃষ্টি হয় শক্তি। জীবের সমস্ত জৈবিক ক্রিয়ার মূলে রয়েছে এই শক্তি। মানুষের ক্ষেত্রে শক্তির এই প্রাথমিক চাহিদাটুকু ছাড়াও কিছুটা বাড়তি চাহিদা রয়েছে। কেননা সে চায় স্বাচ্ছন্দ্য ও জীবনযাত্রার উন্নত মান।

আদিকালের মানুষ পুরোপুরি নির্ভর করত তার পেশী-শক্তির (Muscle power) উপর—কি খাদ্য সংগ্রহে, কি আত্মরক্ষার্থে পেশী-শক্তিই ছিল তার প্রধান সহায়। মানব ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এর অধিকাংশ সময় (শতকরা 77 ভাগ) জুড়ে মানুষ ছিল শিকারজীবি। এরপর আজ থেকে প্রায় দশ হাজার বছর আগে যখন সে প্রথম ফসল ফলাতে শেখে, সে কম শক্তি ক্ষয় করে বেশি পরিমাণে খাদ্য সংগ্রহের পথ খুঁজে পায়। ফলে সে শিকার ছেড়ে কৃষিজীবি হয়ে ওঠে। তখনও কিন্তু সে পেশী-শক্তির অধীন। ক্রমে ক্রমে মানুষ বন্য পশুকে বশে এনে পশু শক্তি (animal power)-কে কাজে লাগাতে শুরু করে। কালে কালে এই শক্তিই মানুষের দৈনন্দিন জীবনে শক্তির প্রধান উৎস হয়ে উঠল।

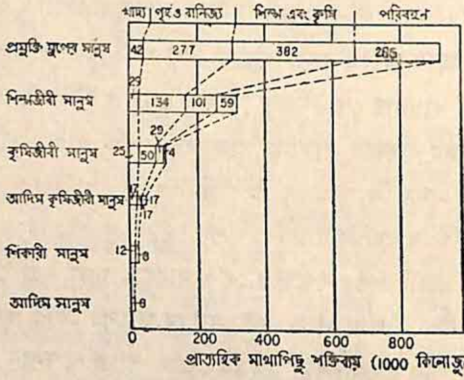
মানুষের প্রকৃত অর্থনৈতিক উন্নতির শুরু হয় যন্ত্র-শক্তি ব্যবহারের পর থেকে। শিল্প-বিপ্লব এবং ঐ সময়ে (1872 সাল) জেমস্ ওয়াটের (James Watt) বাষ্প ইঞ্জিনের আবিষ্কার বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যায় যুগান্তকারী

পরিবর্তন আনে। ক্রমশঃ পেশী-শক্তি ও পশু-শক্তির পরিবর্তে যন্ত্র-শক্তির ব্যবহার বাড়তে থাকল— বিশেষ করে বড় বড় শিল্প ক্ষেত্রে। এই যন্ত্র-শক্তির তখন প্রধান উৎস ছিল বাষ্প-শক্তি (তাপ শক্তি) যা পাওয়া যেত জীবাশ্ম জ্বালানী (বিশেষ করে কয়লা) পুড়িয়ে। জীবাশ্ম জ্বালানীর ব্যাপক ব্যবহারের সূত্রপাতও এখান থেকেই। এই ব্যবহার আরও বহুগুণ বেড়ে গেল যখন বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই বাষ্প ইঞ্জিনের জায়গায় পেট্রোল ও ডিজেল চালিত ইঞ্জিনের ব্যবহার শুরু হল। বড় শিল্পে যন্ত্র-শক্তির ব্যবহার বাড়তে থাকলেও পেশী ও পশু-শক্তিই ক্ষুদ্র শিল্প, চাষবাস, পরিবহন এমন কি ঘরোয়া দৈনন্দিন শক্তি চাহিদার এক বড় অংশ মেটাতো। এমনকি আমেরিকাতে বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (1918 সালে) চাষবাসের কাজে গবাদি পশুর সবচেয়ে বেশি ব্যবহার লক্ষ্য করা গেছে। আজও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোকে এই আদিম উৎসের উপর অনেকাংশে নির্ভর করতে হয়। এই বিষয়ে কেনিয়ায় আন্তর্জাতিক শক্তি-সম্মেলনে (1981 সাল) পরিবেশিত রিপোর্ট হল, "ভারতের সব কটি শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রে যতটা শক্তি উৎপাদিত হয় তার অনেক বেশি শক্তি পাওয়া যায় গরুর গাড়ী থেকে।"

মানব সভ্যতা আরও এক ধাপ এগিয়ে যায় বিদ্যুতের প্রচলনের সাথে সাথে। 1831 সালে মাইকেল্ ফ্যারাডে দেখলেন যে একটি বদ্ধ-পরিবাহী তারের কুণ্ডলীকে শক্তিশালী চুম্বকের দুই বিপরীত মেরুর মাঝে রেখে ঘোরালে ঐ ঘূর্ণায়মান তারে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয়। যান্ত্রিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টির এই কৌশলকে কাজে লাগিয়ে বৃহদাকারে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে। এই যান্ত্রিক শক্তি আবার পাওয়া যায় তিনটি উৎস থেকে—তাপ-শক্তি (তাপ-বিদ্যুৎ), জল-শক্তি (জল-বিদ্যুৎ) ও পারমাণবিক শক্তি (নিউক্লিয়ার পাওয়ার)। বিদ্যুৎ-শক্তির ব্যবহারে খরচ অপেক্ষাকৃত কম, তাছাড়া অন্যান্য নানান সুবিধাও এতে আছে। এই কারণে বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্র ক্রমে ক্রমে চিরাচরিত বাষ্প, পেট্রোল ও ডিজেল চালিত ইঞ্জিনগুলির স্থান দখল করতে থাকে। বৃহৎ শিল্প ছাড়াও উন্নত দেশে বর্তমানে ক্ষুদ্র শিল্প, চাষবাস, যানবাহন ও ঘরোয়া দৈনন্দিন কাজে বিদ্যুতের একচেটিয়া ব্যবহার শুরু হয়েছে।

সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রার মানও বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে তার মাথাপিছু শক্তি-চাহিদা। পরপৃষ্ঠার ছবিতে (চিত্র নং 6) মানব সভ্যতার ছয়টি স্তরে মাথাপিছু দৈনন্দিন শক্তির ব্যয়ের প্রকৃতি ও পরিমাণ

দেখানো হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে শক্তির চাহিদা কিভাবে বেড়ে চলেছে এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। পৃথিবীর সব জায়গায় সভ্যতার এই অগ্রগতি অবশ্য সমানভাবে হয় না। ফলে একটি অনুন্নত দেশে গ্রাম্য শিশুর খাদ্য, শিক্ষা



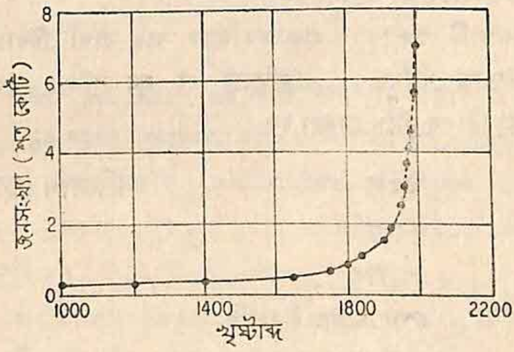
চিত্র—6: সভ্যতার বিভিন্ন স্তরে মাথাপিছু শক্তি ব্যয়। আদিম মানুষের শক্তি ক্ষয় হত কেবল খাদ্য সংগ্রহে: ক্রমে ক্রমে প্রয়োজন বাড়ল, খাদ্য ছাড়াও দরকার হল বাসস্থান, বাণিজ্য, শিল্প, কৃষি, পরিবহনের জন্য শক্তি ব্যয়। আর সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতি খাতেই শক্তি ব্যয় বেড়ে চলল।

ও দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয় তার চেয়ে ঢের বেশি শক্তি প্রয়োজন হয় নিউইয়র্কের সমবয়স্ক একটি শিশুর জন্য। কারণ, তার উচ্চমানের পুষ্টিকর খাদ্য, ঘরের বিজলী বাতি, শীতাতপ নিয়ন্ত্রক, টেলিভিশান, স্কুলে যাতায়াত ও ভ্রমণের জন্যে গাড়ী, খেলাধূলার জন্যে সযত্নে গড়ে তোলা ঘাসের লন ও অন্যান্য সরঞ্জাম ও আসবাব—এ সবের পিছনে প্রচুর শক্তি খরচ হয়ে থাকে। দেখা গেছে আমেরিকার জনসংখ্যা বিশ্ব জনসংখ্যার 6 শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও বিশ্বের মোট শক্তির 35 শতাংশ তারাই খরচ করে থাকে। প্রকৃতপক্ষে কোনও দেশে মাথাপিছু শক্তি-ব্যয় সেখানকার অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নতির স্তর নির্দেশ করে।

বর্তমান শক্তি সংকট:

সাম্প্রতিক শক্তি সংকটের পিছনে যে উন্নত দেশগুলি অনেকাংশে দায়ী—এমন প্রচ্ছন্ন অভিযোগের সুর আজ বিশ্বব্যাপী গুনগুনিয়ে উঠেছে। ঐসব দেশের শক্তিনির্ভর বিলাসবহুল জীবনধারা ও বেহিসেবী পরিকল্পনা ছাড়াও তেল উৎপাদনকারী দেশগুলির স্বার্থের প্রতি এদের চরম অবহেলা পরিস্থিতিকে

ঘোরালো করে তুলেছে। এর ফলে তেল উৎপাদনকারী দেশগুলি সংঘবদ্ধ হয়ে সৃষ্টি করেছে 'ওপেক' (**Organisation of Petroleum Exporting Countries**)। এরা আজ পেট্রোলিয়ামকে "তরল সোনা" বলে চিনতে পেরে গত এক দশক ধরে (বিশেষ করে **1973** সাল থেকে) ক্রমাগত এর দাম বাড়িয়ে চলেছে। ফলে এক চরম সংকটের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশগুলি, যেখানে বিশ্বের জনসংখ্যার সিংহভাগ (দুই-তৃতীয়াংশ), অর্থাৎ দুশো কোটিরও বেশি মানুষ বসবাস করে। দেখা গেছে যে এমন **133**টি দেশের মধ্যে নব্বুইটিই এই প্রাকৃতিক সম্পদ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত। বাদ বাকিদের নিজস্ব উৎপাদন চাহিদার তুলনায় যৎসামান্য। সুতরাং সবারই কমবেশি আমদানীর উপর নির্ভর করতে হয়। যেমন, আমাদের দেশে বর্তমান চাহিদার প্রায় শতকরা **45** ভাগ মাত্র তেল উৎপাদিত হয়। শীঘ্রই এই উৎপাদন বাড়িয়ে চাহিদার প্রায় **60** শতাংশ পূরণের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হলেও বাকিটুকুর জন্যে আমাদের অদূর ভবিষ্যতেও অপরের উপর নির্ভরশীল থাকতে হবে। কালে কালে তেল দুর্মূল্য হয়ে ওঠায় তা এই সব দেশের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। অথচ সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির নিম্নতম মান অর্জন করতে গেলেও অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলিকে বর্তমানের শক্তিব্যয়কে আগামী দিনে তিনশ গুণ বাড়িয়ে দিতে হবে।



চিত্র—7 : বিশ্বের জনসংখ্যা জ্যামিতিক হারে বাড়ছে। অর্থাৎ আজ দুই হলে কাল চার, তার পরদিন আট, তারপরে ষোল, বত্রিশ, চৌষট্টি, ...। বর্তমানে বিশ্বের জনসংখ্যা অন্ততঃ তিনশ কোটি; অনেকেই মনে করেন 2000 সালে এই সংখ্যা দাঁড়াবে ছ'শ কোটিতে।

জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ছাড়াও শক্তি চাহিদার উর্ধ্বগতির দ্বিতীয় কারণ হল বর্ধিত জনসংখ্যা। ম্যাল্‌থাসের (Malthus) ভবিষ্যৎবাণী বলে, বিশ্বের জনসংখ্যা বাড়বেই (চিত্র—7)—বিশেষ করে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে এবং আরও বেশি করে অনুন্নত দেশগুলিতে। এই সব কারণে আগামী মাত্র 50 বছরে যে পরিমাণ শক্তি ব্যয় হবে তা আজ পর্যন্ত মানুষ মোট যত শক্তি ব্যয় করেছে তার তুলনায় তিন থেকে পাঁচ গুণ বেশি। এই কাজকে ত্বরান্বিত করবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা—নতুন নতুন কৌশল বার ক'রে ও উন্নত মানের যন্ত্রপাতি আবিষ্কার ক'রে। কিন্তু এর ফলে দুটি সমস্যা অবধারিতভাবে দেখা দেবে।

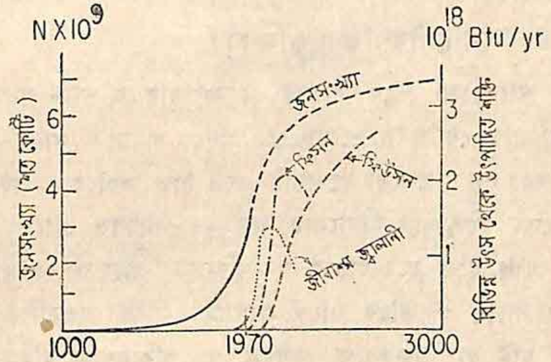
প্রথমতঃ জীবাশ্ম জ্বালানীর এই ব্যবহার পরিবেশকে ক্রমশঃ দূষিত করবে। এই সব জ্বালানী মূলতঃ কার্বন ও হাইড্রোজেনের যৌগ—হাইড্রোকার্বন। ফলে এদের জ্বালালে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস (ও জলীয় বাষ্প) উৎপন্ন হয়। আবহাওয়ার ভারসাম্য পরিবর্তনে এর যথেষ্ট হাত রয়েছে (পূর্বের আলোচনা ও 8 নং চিত্রে দ্রষ্টব্য)। অন্যদিকে পরমাণু শক্তির ক্ষেত্রে অব্যবহৃত জ্বালানী এমন কি উৎপাদনজাত ভস্ম (বা অবশেষ) প্রচণ্ডভাবে তেজস্ক্রিয়। এই সব তেজস্ক্রিয় অবশেষ নিরাপদে সংরক্ষণ করা এক কঠিন সমস্যা। ফলে তেজস্ক্রিয়তার দরুন পরিবেশ দূষিত হওয়ার সমস্যাটি থেকেই যাচ্ছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পারমাণবিক বিস্ফোরণের অভিজ্ঞতায় এই তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব কত ভয়াবহ হতে পারে সে ত মানুষের অজানা নয়।

দ্বিতীয় সমস্যাটি গুরুতর। প্রকৃতির বুকে ধরে রাখা চিরাচরিত শক্তি-ভাণ্ডারগুলি নিতান্ত সীমিত। প্রকৃতিতে এই সব শক্তির সম্ভাব্য সঞ্চয়ের মোটামুটি একটা হিসেব নীচে দেওয়া হল।

শক্তি	উৎস	পরিমাণ (Q)[7]
জীবাশ্ম	কয়লা	88
	পেট্রোল	6
	শেল্ অয়েল ইত্যাদি	12
	মোট	106
জল-বিদ্যুৎ		0·1 (বছরে)

7. এক Q হল 10^{21} জুল।

এদিকে শক্তি-চাহিদা যেভাবে বেড়ে চলেছে তাতে ধরিত্রীর এই শক্তির ভাঁড়ার আগামী কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যাবে। অর্থাৎ শক্তির উৎপাদন প্রথম দিকে বেড়ে গিয়ে একটি সর্বোচ্চ মান স্পর্শ করার পর কমতে থাকবে ও এক সময় শূন্য হবে (চিত্র—8)। ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং শেষ দিকের ক্রমক্ষীয়মান উৎপাদনের ফলে শক্তি-সমস্যা আরও জটিল ও গুরুতর



চিত্র—8 : জনসংখ্যা বাড়লেও প্রচলিত শক্তি উৎসগুলির ভাঁড়ার সীমিত। জীবাশ্ম জ্বালানীর উৎপাদন, এমনকি ফিসন্ জ্বালানীও কিছুকাল পরে কমতে থাকবে। একমাত্র টিকে থাকতে পারে ফিউসন্ জ্বালানী। এর প্রযুক্তি এখনও আমাদের হাতের বাইরে, তাই তা থেকে শক্তি উৎপাদন এখনও শুরু হয়নি।

আকার ধারণ করবে সন্দেহ নেই। এই সমস্যা সমাধানে প্রকৃতিতে পারমাণবিক শক্তির সম্ভাব্য বিপুল সঞ্চয়ের কথা মনে রেখেও উৎপাদন ব্যয়, উন্নত কারিগরি-বিজ্ঞান নির্ভরতা, উৎপাদনজাত তেজস্ক্রিয় ভস্মাদির সংরক্ষণ প্রভৃতি সমস্যা আগামী দিনের শক্তি-চাহিদা পূরণে পারমাণবিক শক্তির ভূমিকার সীমাবদ্ধতাকে প্রকট করে তুলছে।

ভারতবর্ষে জীবাশ্ম জ্বালানীর সম্ভাব্য সঞ্চয় অনেক দেশের চেয়েই সন্তোষজনক। সহায়ক ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে যথেষ্ট জল-বিদ্যুৎ উৎপাদনও সম্ভব। দেখা গেছে যে ভারতের জনসংখ্যার আশি শতাংশই গ্রামের অধিবাসী। এরা পেশী-শক্তি, পশু-শক্তি এবং কাঠ, পাতা ঘুঁটে প্রভৃতি গ্রামীন জ্বালানী থেকে যে পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করে ($4{\cdot}28 \times 10^{18}$ জুল প্রতি বছরে) তা এদেশে ব্যবহৃত

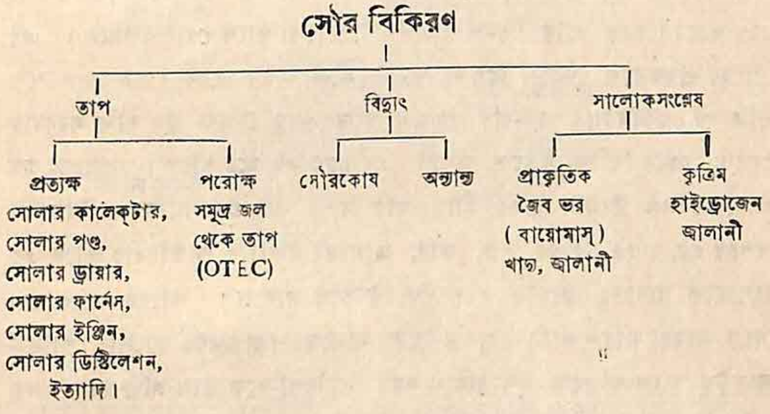
কয়লা, পেট্রোল, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বাণিজ্যিক শক্তিগুলির (5.0×10^{17} জুল প্রতি বছরে) চেয়ে প্রায় দশ গুণ বেশি। সব মেনে নিলেও আত্মতুষ্টির কোনও কারণ নেই। কেননা, ক্রমবর্ধমান শক্তি-চাহিদার কতটুকু এভাবে মেটানো যাবে সে প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে। তাছাড়া আগামী দিনে বিশ্ব জুড়ে জ্বালানীর জন্য হাহাকার শুরু হলে তার ঢেউ নিঃসন্দেহে এদেশেও এসে পড়বে।

শক্তি সংকট ত্রাণে সৌরশক্তির ভূমিকা:

পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, শক্তি সমস্যাকে ঘিরে আজ সারা দুনিয়ায় যে হৈ চৈ পড়েছে তা অদূর ভবিষ্যতে মানব সভ্যতাকে সম্ভবতঃ সব চেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি এনে দাঁড় করাবে। এই চ্যালেঞ্জে তাকে জিততেই হবে, মান বাঁচানোর জন্য নয়—নিতান্ত প্রাণের তাগিদে। তাই মানুষ আজ হন্যে হয়ে বাঁচার পথ খুঁজছে। আর তা হল শক্তির নতুন নতুন উৎসের সন্ধান ও তাকে কাজে লাগানো। এই অপ্রচলিত উৎসগুলি এমন হওয়া চাই যা প্রকৃতপক্ষে অফুরন্ত, যা পরিবেশকে দূষিত করে না এবং যা অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ক্ষেত্রে উপযোগী—বিশেষতঃ গ্রামের মানুষের ক্ষেত্রে। তারা নিজেরাই ছোট ছোট কেন্দ্রে শক্তি উৎপাদন করতে পারবে, কেন্দ্রীয় কোন উৎপাদন ব্যবস্থা ছাড়াই। ফলে থাকবে না পরিবহণ সমস্যা, যার ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে শক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ অপচয় হয়।

সব দিক বিবেচনা করলে যে উৎসের কথা প্রথমেই মনে আসে তা হল সৌরশক্তি—যা প্রতিদিন অফুরন্ত ধারায় পৃথিবীর বুকে ছড়িয়ে পড়ছে। এর এক নগণ্য অংশকে কাজে লাগাতে পারলে আমাদের চাহিদা অংশত এমনকি পুরোপুরি মেটানো সম্ভব। কিন্তু সূর্য থেকে যে শক্তি প্রতিদিন আমরা পাই তা অফুরন্ত, প্রচুর হলেও বড়ই বিক্ষিপ্ত। এই সৌর বিকিরণ সরাসরি ব্যবহার করে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ শক্তি সংগ্রহ করা এক জটিল কাজ। সংগ্রহ যদি বা করা গেল, সেই শক্তিকে সঞ্চয় করে রাখাও শক্ত এবং ব্যয়সাধ্য কাজ। অথচ রোদ্দুর ত পাওয়া যায় মাত্র দিনের বেলায়। তাই দিন থাকতে থাকতে সংগ্রহ করে তা রাতের জন্যে রেখে দিতে না পারলে চলবে কি করে? অতএব সমস্যা বহুবিধ।

কিন্তু বিজ্ঞান এত সহজে হার মানতে রাজী নয়। সৌরশক্তিকে কি ভাবে মানুষের কাজে লাগানো যায়, তা নিয়ে দিকে দিকে চলেছে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা। হয়তো মানুষের জয়যাত্রার এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হতে চলেছে। এই ব্যাপারে পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। তার আগে যে বিভিন্ন পথ ও পদ্ধতির মাধ্যমে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করার চেষ্টা করা হচ্ছে তা নীচের তালিকায় উল্লেখ করা হল।



সৌরশক্তি থেকে তাপ

"বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে শক্তির পরিমাণ চিরস্থির"—ক্লসিয়াস্।

সহজ ও স্বল্প ব্যয়সাধ্য পদ্ধতি ঃ

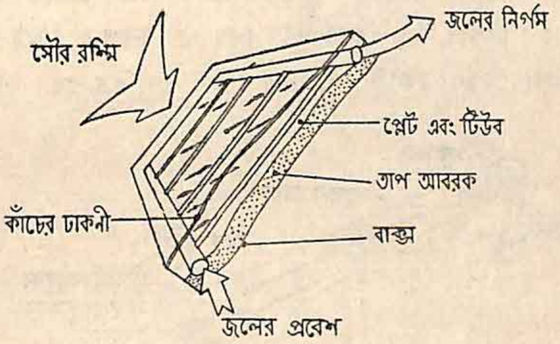
সহায়ক ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে আমাদের এই ভারতবর্ষে বছরে বেশির ভাগ সময়ে (গড়ে প্রায় তিনশ দিন) আবহাওয়া থাকে রোদ-ঝলমলে। এই রোদের প্রখরতাও তেমন উপেক্ষা করার মতো নয়। দেখা গেছে যে এদেশে প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে সূর্য-রশ্মি দৈনিক গড়ে প্রায় 2800 জুল শক্তি সরবরাহ করে। বছরে বিভিন্ন ঋতুতে অবশ্যই এর হেরফের ঘটে থাকে। সবচেয়ে কম যখন, তখনও 2100 জুলের নীচে যায় না। এই প্রচুর শক্তির বেশীরভাগই অপচয় হয়, যদিও বিভিন্ন শস্য, কাঠ, জ্বালানী ইত্যাদি শুকোনোর কাজে এর যৎসামান্য ব্যবহার প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। আগের আলোচনা থেকে আমরা আরও জানি যে, ভূ-পৃষ্ঠে আছড়ে পড়া সূর্যের আলোর শোষিত অংশটুকু তাপ-শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সৌরশক্তিকে তাপ-শক্তি ছাড়া অন্য শক্তিতে রূপান্তরিত করা সহজসাধ্য নয়। ফলে কম খরচে সহজতম উপায়ে সৌর-শক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ হল একে তাপ-শক্তি হিসেবে কাজে লাগানো। আর এইভাবে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর অসংখ্য নজীরও রয়েছে। বিভিন্ন কৃষিজ, বনজ ও খনিজ পদার্থ শুকোনো ছাড়াও সমুদ্রজল থেকে লবণ তৈরীর কাজেও সৌর-তাপের ব্যবহার বহু পুরোনো আমল থেকেই চলে আসছে। এই পদ্ধতিকে আরও কার্যকরী করে তোলার জন্যে বিভিন্ন ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রতিফলক ও গ্রাহক ব্যবহার করা হচ্ছে।

সোলার কালেক্টার (Solar Collector) ঃ

আমরা জানি যে ভূ-পৃষ্ঠ থেকে সূর্যের আলোর এক উল্লেখযোগ্য অংশ প্রতি-ফলিত হয়ে মহাশূন্যে ফিরে যায়। একই ঘটনা ঘটে কোনও জিনিষ সরাসরি সূর্যের আলোয় মেলে ধরলে। তাছাড়া শোষিত আলো থেকে যে তাপ সৃষ্টি হয় তারও কিছুটা পরিবহণ, পরিচলন ও বিকিরণ পদ্ধতিতে ক্ষয় পায়। এই ক্ষয়ক্ষতিগুলি যথাসম্ভব কমিয়ে আনা সম্ভব "সোলার কালেক্টার" বা সৌরশক্তির

সংগ্রাহক ব্যবহার করে। তাছাড়া সূর্যের আলো থেকে তাপ সৃষ্টির কাজটাও করে থাকে এই সোলার কালেক্টার।

দেশ-বিদেশের গবেষণাগারে নানান রকমের নানা গঠনের অসংখ্য সোলার কালেক্টারের নক্সা তৈরী করা হয়েছে। এদের উপরিতল সমতলযুক্ত (Flat plate type), বা বক্রতলযুক্ত (Parabolic concentrator type)—এই

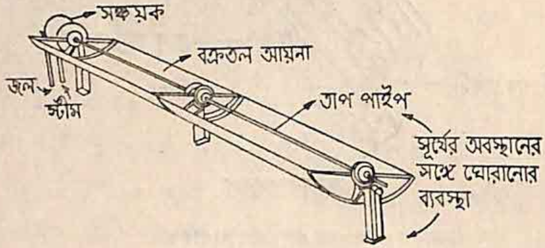


চিত্র—9 : সমতল সৌররশ্মি সংগ্রাহক

দুই ধরনের হতে পারে। তাছাড়া এই তল মসৃণ, অমসৃণ এমনকি ঢেউ তোলা ধরনেরও হয়। গঠনগত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও এর কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে এর উন্মুক্ত তলটি যে বস্তু দ্বারা আবৃত তার প্রতিফলন ক্ষমতা, শোষণ ক্ষমতা, তাপ পরিবহণ গুণাংক, আপেক্ষিক তাপ ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ধর্মাবলীর উপর। গ্রাহকের দক্ষতা বাড়াতে গেলে আলোর অবলোহিত অংশের প্রতি এর শোষণ ক্ষমতা বাড়াতে হবে আর সেই সঙ্গে গ্রাহক তল থেকে এই আলোর নিঃসরণের মাত্রাও কমাতে হবে। গ্রাহক তলের শোষণ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে কালো রঙের প্রলেপ লাগানো হয়; এছাড়া বিভিন্ন ধরনের আস্তরণ বা প্রলেপ (Selective surface)-এর ব্যবহারও লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি চকচকে সুপরিবাহী ধাতুপাতের উপর অর্ধ-পরিবাহী পদার্থের এক পাতলা আস্তরণ (Selective bulk coatings) গড়ে এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন, সিলভার, মলিব্‌ডেনাম ধাতুর উপর সিলিকন বা জার্মেনিয়ামের প্রলেপ বা তামার পাতের উপর তার অক্সাইডের প্রলেপ ইত্যাদি। অর্ধ পরিবাহী পদার্থ সূর্যের আলোর অবলোহিত অংশকে বের করে দেয়। কিন্তু কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের

আলোকে সহজেই শোষণ করে নেয়। ফলে এই স্তর ভেদ করে অবলোহিত রশ্মি ভিতরের ধাতব পাতটিকে সহজেই উত্তপ্ত করে।

গ্রাহকতল থেকে এই শোষিত তাপ সঞ্চয় আধার বা কর্মরত সিস্টেমে চালিত করা হয় জল, পারদ প্রভৃতি তরলের সাহায্যে। সঞ্চালিত তরলের প্রবাহ-নল, সমতল গ্রাহকের তল বরাবর থাকে (চিত্র—9)। আর সিলিণ্ডারের মতো অবতল গ্রাহকের ক্ষেত্রে ফোকাস বরাবর থাকে (চিত্র—10)। গ্রাহকতল বরাবর প্রবাহিত হওয়ার সময় তরলটি তাপ গ্রহণ করে উত্তপ্ত হয়ে উঠে। থার্মো-সাইফন্ প্রক্রিয়ায় উত্তপ্ত তরলটি সিস্টেমের দিকে প্রবাহিত হয়। সিস্টেমকে

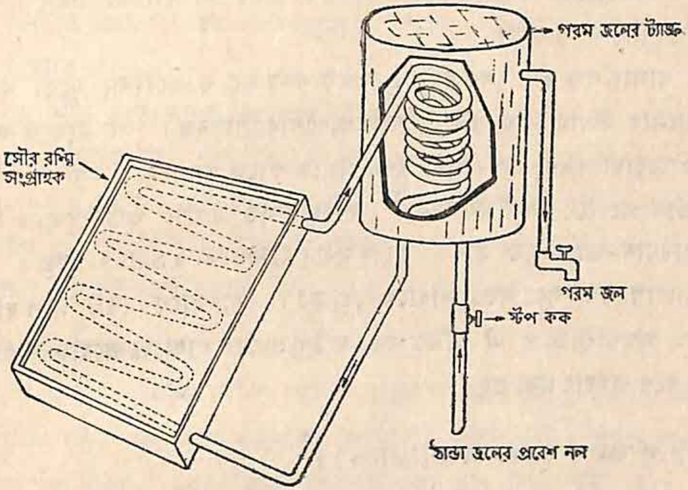


চিত্র—10 : বক্রতল সৌররশ্মি সংগ্রাহক। তাপ পাইপ ফোকাসে রাখা আছে

তাপ দিয়ে, ঠাণ্ডা তরলটি আবার গ্রাহক তলে ফিরে আসে। গ্রাহক থেকে যে তাপ পাওয়া যায় তাতে সিস্টেম্‌কে 60 থেকে 600 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করা যায়। উচ্চ তাপমাত্রার ক্ষেত্রে অবতল প্রতিফলক ইত্যাদি ব্যবহার করে সূর্যরশ্মিকে ঘনীভূত করা হয় এবং পরিবহণ ও পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপক্ষয় কমিয়ে আনা হয়।

গ্রাহকের কার্যকারিতা আবার অনেকাংশে নির্ভর করে একে কিভাবে বসানো হয়েছে, তার উপর। আলোর শোষণ সবচেয়ে বেশি হয় যখন সূর্যরশ্মি লম্বভাবে গ্রাহকতলে পড়ে। এই শর্ত পূরণের জন্যে দিনের বিভিন্ন সময়ে সূর্যের অবস্থান পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাহক তলকেও ঘোরানোর প্রয়োজন হয়। একইভাবে সূর্যের বার্ষিক গতিকেও অনুসরণ করা চাই (Sun tracking device)। এ ছাড়া গ্রাহকতলকে একটি নির্দিষ্ট কোণে আনত রাখা হয়। এই অবনতি ঐ স্থানের অক্ষাংশের উপর নির্ভর করে। এত কর্মকাণ্ড অবশ্য ছোটখাট ঘর-গেরস্থালীর কাজে আবশ্যিক নয়। নির্দিষ্ট অবনতিতে সংগ্রাহককে

বসিয়ে রাখলেই 60-70 ডিগ্রি পর্যন্ত তাপ পাওয়া যায় অনায়াসেই—জল গরম করা বা এজাতীয় অন্যান্য কাজ তাতেই চলে যায়।



চিত্র—11 : সমতল সংগ্রাহকের সাহায্যে বাড়ীর কাজের (স্নান, জামাকাপড় কাচা, হাত মুখ ধোয়া) জন্য গরম জল তৈরী করা যায়।

সোলার পণ্ড :

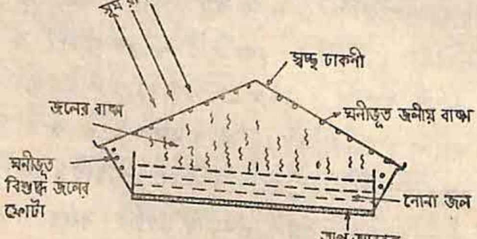
বৃহদাকারে সৌরশক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিরাচরিত সোলার কালেক্টার পর্যাপ্ত নয়—এই জন্যে প্রয়োজন হল সৌর পুষ্করিণীর (**Solar pond**)। প্রকৃতপক্ষে এ এক বিশালাকৃতির সোলার কালেক্টার ও একই সঙ্গে তাপ সঞ্চয়ের আধার। ভাইন্‌বার্গার (Weinberger) প্রথম এর গাণিতিক মডেলটি তৈরী করেন। এটি একটি বড়সড় (25×25 বর্গমিটার) ট্যাঙ্ক, যার তলদেশে লাগানো থাকে কালো রঙের প্রলেপ। এতে থাকে স্তরে স্তরে বিভিন্ন ঘনত্বের লবণের দ্রবণ (যেমন সাধারণ লবণ, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ইত্যাদি)। সবার নীচের স্তরের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি এবং ঐ স্তরটিই সবচেয়ে বেশি উত্তপ্ত হয় কালো প্রলেপের সংস্পর্শে থাকায়। নীচে থেকে উপরের দিকে স্তরগুলিতে ঘনত্ব ও তাপমাত্রার এই ক্রমক্ষীয়মান সজ্জার জন্যে এতে পরিচলন ক্রিয়া বন্ধ থাকে। তাছাড়া জল, তাপের কুপরিবাহী হওয়ায় আভ্যন্তরীণ স্তর থেকে পরিবহণ

পদ্ধতিতে তাপক্ষয় হয় খুব কম। এবার সর্বনিম্ন স্তরের উত্তপ্ত (90 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বা তার বেশি) দ্রবণকে কাজে লাগানো হয়। সৌরতাপ থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সম্প্রতি সোলার পণ্ডের কার্যকারিতা নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।

সোলার পণ্ড ছাড়া অন্যত্র সৌরতাপকে সঞ্চয় করা ও প্রয়োজন মতো কাজে লাগানোর উপায় বার করাও আজ গবেষণার বিষয়বস্তু। এই উদ্দেশ্যে একটি ব্যবহারযোগ্য পদ্ধতি হল লবণের গলনতাপকে কাজে লাগানো। আমরা জানি যে তাপ প্রয়োগে একটি বস্তু গলে। অর্থাৎ গলিত বস্তুটির কঠিনীভবনের সময় সমপরিমাণ তাপ মুক্ত হবে। গ্লবার সল্ট (Glauber's Salt) প্রভৃতি উচ্চ গলন-তাপবিশিষ্ট লবণ সঞ্চয় আধারে রাখা হয়। সৌরতাপে বস্তুটি গলে যায়। সূর্যের অনুপস্থিতিতে ঐ গলিত বস্তুর কঠিনীভবনের সাহায্যে প্রয়োজনীয় তাপ মুক্ত করে ব্যবহার করা হয়।

সৌর পাতন (Solar distillation) :

আমরা জানি যে পাতন প্রক্রিয়ায় অশোধিত জল ফুটিয়ে উৎপন্ন জলীয় বাষ্পকে ঠাণ্ডা ও ঘনীভূত করে বিশুদ্ধ জল পাওয়া যায়। জল ফোটানোর জন্যে যে প্রচুর তাপের প্রয়োজন তা পাওয়া যায় জ্বালানী পুড়িয়ে। সৌর পাতন প্রক্রিয়ায় বাষ্পীভবনের প্রয়োজনীয় তাপটুকু সংগ্রহ করা হয় সূর্যের আলো থেকে। সৌর পাতন যন্ত্র গঠনের দিক দিয়ে সাধারণ পাতন যন্ত্রের থেকে একেবারে আলাদা।



চিত্র—12 : নোনা জল থেকে সৌরশক্তির সাহায্যে সুপেয় জল

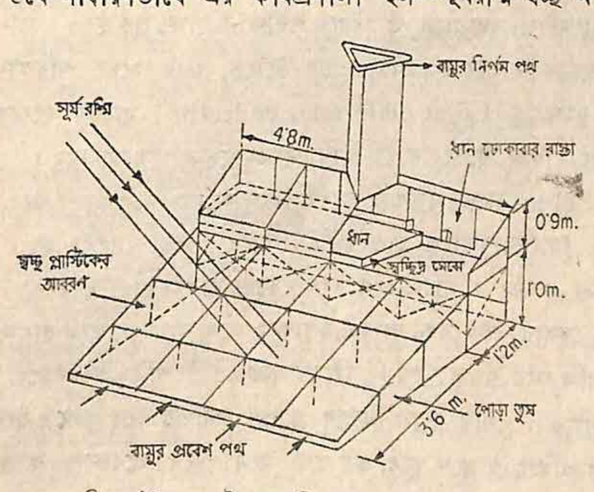
একটি বড় মাপের পাত্রে রাখা অশোধিত জল সূর্যতাপে বাষ্পীভূত করা হয়। পাত্রটির মুখে একটি স্বচ্ছ পদার্থের ঢাকনী থাকে। ফলে আলো সহজেই পাত্রের

অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। ঢাকনীটি এমন ঢালুভাবে বসানো থাকে যে ঢাকনীর গায়ে ঘনীভূত জল ঢালু গা বেয়ে গড়িয়ে এসে সংগ্রাহক পাত্রে জমা হয় (চিত্র—12)। এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য হল এই যে সাধারণ পাতনের মতো এতে জল ফোটার প্রয়োজন হয় না—শুধুমাত্র বাষ্পায়ন হলেই সৌর পাতনক্রিয়া চলতে পারে।

পদ্ধতিটির দক্ষতা বাড়ানোর জন্যে নানা প্রকার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এ বিষয়ে দেশে-বিদেশে জোর কদমে কাজ হচ্ছে। এই সঙ্গে চেষ্টা করা হচ্ছে এর উৎপাদন ব্যয় যথাসাধ্য কমানো। অপেয় ও লবণাক্ত জল সৌর পাতন প্রক্রিয়ার সাহায্যে পরিশোধিত করে সুপেয় জল পাওয়া যায়। এই কাজেই সৌর পাতন প্রক্রিয়ার সর্বাধিক ব্যবহার দেখা যায়।

সৌর বিশুষ্কক (Solar drier) :

শস্য প্রভৃতি নানান জিনিষ সূর্যের আলোয় মেলে দিয়ে মুক্ত বাতাসে শুকোনো হয়। এই কাজ আরও দ্রুত করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ড্রায়ার সম্প্রতি ব্যবহার করা হচ্ছে। যে সব জিনিষ শুকোনো হবে তার উপর নির্ভর করে এর নক্সা। তবে সাধারণভাবে এর কার্যপ্রণালী হল—সূর্যরশ্মি স্বচ্ছ আবরণ ভেদ



চিত্র—13 : একটি বৃহদাকৃতি সোলার ড্রায়ারের নক্সা

করে ড্রায়ারে প্রবেশ করে ও ভেতরের বায়ুকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত বায়ু হাল্কা—উপরে উঠে একমাত্র নির্গম পথ দিয়ে বেরিয়ে যায়, এই সঙ্গে ভেতরের জলীয়

বাষ্পও বার করে নিয়ে যায়। নীচে নির্দিষ্ট প্রবেশ পথ দিয়ে টাট্‌কা বায়ু ভেতরে ঢোকে। এই ভাবে বায়ু চলাচল করার ফলে খুব অল্প সময়ে ড্রায়ারের ভেতরের জিনিষপত্র শুকিয়ে যায় (চিত্র—13)।

ড্রায়ার ব্যবহারের ফলে শুধুমাত্র শুকোনোর কাজই দ্রুততর হয় না, খাদ্যদ্রব্য, রাসায়নিক পদার্থ ইত্যাদিকে ধূলোবালি, পোকামাকড় এমনকি বৃষ্টির হাত থেকেও রক্ষা করা হয়। সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়ায় কাঠ শুকোনোর জন্যেও ড্রায়ার নির্মাণ করা হচ্ছে। ড্রায়ারের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলার জন্যে দেশ-বিদেশে গবেষণা চলেছে।

শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ও রেফ্রিজারেশন ঃ

শীতপ্রধান অঞ্চলে দৈনন্দিন ঘরোয়া কাজে প্রয়োজনীয় শক্তির প্রায় এক-চতুর্থাংশ ব্যয়িত হয় বাসগৃহের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে। এছাড়া অফিস, দোকান-পাট, হাসপাতাল এমনকি বাস স্টেশনও গরম এবং আরামদায়ক রাখতে প্রচুর শক্তি খরচ হয়। এই কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার আজ প্রায় একচেটিয়া। এই সব ক্ষেত্রে সৌরশক্তির ব্যবহার যথেষ্ট সম্ভাবনাময়। বর্তমান শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে এই বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। আজ পর্যন্ত যে বিভিন্ন ধরনের সোলার রুম্ হীটার গড়ে উঠেছে, তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সমতল সংগ্রাহক (**Flat plate solar collector**) ব্যবহৃত হয়েছে। তাপ সঞ্চালনের মাধ্যম হিসেবে কাজে লাগানো হয়েছে জল অথবা বায়ু। সৌরশক্তি-ভিত্তিক তাপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার কার্যকারিতা অনেক দেশে নির্ভর করে স্থাপত্যের ওপর। গৃহ নির্মাণকালে প্রয়োজনীয় বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়। তাছাড়া সৌরশক্তি কাজে লাগাতে হলে তাপ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন। কেননা, রাতের বেলায় শীত যখন আরও জাঁকিয়ে পড়ে বাসস্থান গরম রাখার প্রয়োজন তখন বেশি করে অনুভূত হয়। দিনের সঞ্চিত সৌরশক্তি এই সময়ে খরচ করা যেতে পারে। সৌর তাপ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা জনপ্রিয় করে তুলতে হলে এর খরচ যথাসম্ভব কমিয়ে আনতে হবে, এই কথা মনে রেখে গবেষণার কাজ অব্যাহত রয়েছে।

এছাড়া ঘরের কাজে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে গরম জল তৈরীতে সৌরশক্তির ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ (air

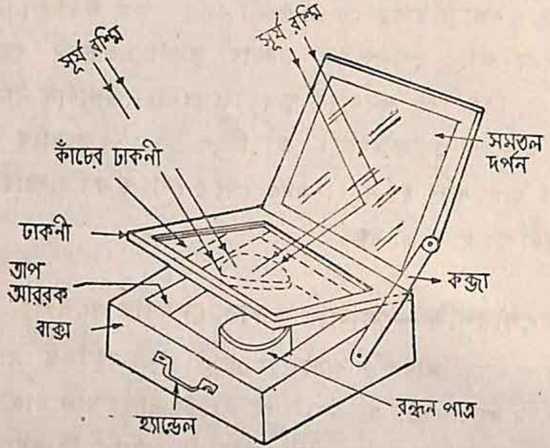
conditioning) এবং রেফ্রিজারেশনের কাজেও সৌরশক্তি ব্যবহারের চেষ্টা চলেছে। এই তুটি কাজই দিনের ঝলসানো রোদেই সর্বাধিক প্রয়োজন হয়। তাই এতে তাপ সঞ্চয়ের ব্যবস্থা তেমন জরুরী নয়। ফলে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ আর রেফ্রিজারেশনের কাজে সৌরশক্তির ব্যবহার তুলনামূলকভাবে স্বল্পব্যয়সাধ্য। বিভিন্ন স্থানের ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ুর পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী নানা ধরনের মডেল তৈরী করেছেন প্রযুক্তিবিদ্‌রা। গ্রামাঞ্চলে বিত্যুতের অভাবে জীবনদায়ী ওষুধ ঠাণ্ডায় রাখা সম্ভব হয় না। এসব ক্ষেত্রে সৌরশক্তির ব্যবহার চালু হলে সমস্যার কিছুটা সুরাহা হওয়া সম্ভব।

রন্ধনকার্যে সৌরশক্তি—সোলার কুকার, সোলার ওভেন :

রান্নাবান্নার কাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রচেষ্টা নতুন নয় কিন্তু নানা কারণে এই চেষ্টা তেমন ফলবান হয়ে ওঠেনি। এই প্রচেষ্টা সার্থক হলে ভারতবর্ষের মত উন্নয়নশীল দেশে, বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে, জ্বালানী খরচের সিংহভাগ বাঁচানো যাবে। ফলে এই সব জ্বালানীর প্রধান উৎস অর্থাৎ গোবর ও গাছপালার দেহাবশেষ পচিয়ে উন্নত ধরনের সার তৈরী করে কৃষি উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হবে।

বিভিন্ন ধরনের বিভিন্ন গঠনের বহু সোলার কুকার ও সোলার ওভেন্ (oven) আছে। গঠনগত বৈশিষ্টা অনুযায়ী ব্যবহৃত প্রতিফলকটিকেও (reflector) বিশেষভাবে তৈরী করা হয়। এই গঠনের উপর নির্ভর করে এর কার্যকারিতা। এগুলির মধ্যে ছত্রাকৃতি প্রতিফলকবিশিষ্ট কুকার "Umbroiler" আমেরিকায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সোলার কুকার বা ষ্টোভ ব্যবহারের স্থবিধা হল এই যে, এতে জ্বালানী খরচ ও দেশলাই খরচ নেই, ব্যবহার পদ্ধতিটি অতি সহজ, তুর্ঘটনার সম্ভাবনা নেই এবং সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় বাইরে বেড়াতে গিয়ে বা বনভোজনে বা ক্যাম্পে থাকার সময়ে অনায়াসে ব্যবহার করা যায়। সোলার ওভেনের বাড়তি স্থবিধাটুকু হল রান্নার কাজ ছাড়াও এতে রুটি, বিস্কুট প্রভৃতি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় রেখে সেঁকে নেওয়া যায়। তাছাড়া খাদ্যবস্তু গরম রাখার জন্যেও সোলার ওভেন ব্যবহৃত হয়। সোলার ওভেনের কাজে (পৃঃ 13 দ্রষ্টব্য) "গ্রীন হাউজ" তত্ত্বের নীতিকে প্রয়োগ করা হয়। তাপ সহজেই ওভেনের ভেতর প্রবেশ করতে পারে, কিন্তু বেরিয়ে আসতে পারে না। কিছু কিছু ওভেনে আবার তাপ সঞ্চয়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। ফলে সূর্যের অনুপস্থিতিতে বেশ

কয়েক ঘণ্টা পরেও একে কাজে লাগানো সম্ভব। তবে সোলার কুকার এবং ওভেনের অসুবিধা হল যে, ছায়ায় বা মেঘলা দিনে একে ব্যবহার করা যায় না।



চিত্র—14 : বাক্স জাতীয় সোলার কুকার

14 নং চিত্রে একটি বাক্স জাতীয় সোলার কুকারের কার্যপ্রণালী দেখানো হয়েছে। সূর্যরশ্মি সরাসরি বা সমতল দর্পণে প্রতিফলিত হয়ে একটি তাপ-আবরিত বাক্সে প্রবেশ করে। ঐ বাক্সের মাঝখানে রন্ধন পাত্রটি রাখা থাকে। সমতল দর্পনটি প্রয়োজনমতো নির্দিষ্ট কোণে আনত করে সূর্যরশ্মিকে বাক্সের ঠিক মাঝখানে ফেলা হয়। তাপ ধরে রাখার উদ্দেশ্যে বাক্সের উন্মুক্ত তলে কাঁচের ঢাকনী থাকে।

অবতল দর্পণযুক্ত কুকারের ক্ষেত্রে রান্নার পাত্রটিকে রাখা হয় দর্পণের ঠিক ফোকাসে। কেননা, ঐ ফোকাসেই তাপ পাওয়া যায় সবচেয়ে বেশি (আলোকচিত্র—5)।

সৌর চুল্লী (Solar furnace):

সোলার কুকারের অনুরূপ কার্যনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সৌর চুল্লী বা সোলার ফার্নেস। এ ক্ষেত্রে অতি উচ্চ তাপের প্রয়োজন। তাই ফার্নেসে প্রতিফলক সংখ্যায় বেশি থাকে এবং আকারেও বেশ বড় হয়। বিভিন্ন ধরণের সোলার ফার্নেস গড়ে তোলা হয়েছে। প্রত্যেকটিই গঠনগত দিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এদের কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে যাতে একটা মোটামুটি ধারণা জন্মায়

সেই উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের মণ্ট লুইয়ের এক দুর্গে স্থাপিত পৃথিবীর বৃহত্তম সোলার ফার্নেসের কথায় আসা যাক।

এটি পঁয়ত্রিশ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি বিশালাকৃতির ফার্নেস। হাজার হাজার দর্পণ দিয়ে গড়া ও প্যারাবলিক (**parabolic**) কালেক্টারযুক্ত। কিছু দূরে আনুভূমিক অবস্থায় রাখা আছে সমতল দর্পণ, যা সূর্যের গতিপথ অনুসরণ করতে পারে। একে হেলিওস্টাট (**Heliostat**) বলা হয় (আলোক চিত্র—6)। সূর্যরশ্মি হেলিওস্টাট থেকে প্রতিফলিত হয়ে কালেক্টারে পড়ে ও দ্বিতীয় বার প্রতিফলিত হয়ে কালেক্টারের ফোকাসে মিলিত হয়। এর ফলে ফোকাসে যে প্রচণ্ড পরিমাণে তাপ সৃষ্টি হয়, তা প্রায় একশ' পাউণ্ডের মতো ধাতু বা ধাতুসংকরকে একেবারে গলিয়ে ফেলতে পারে (আলোক চিত্র—7)।

সোলার ফার্নেস ব্যবহার করে উন্নয়নশীল দেশে শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহৃত শক্তির এক উল্লেখযোগ্য অংশ বাঁচানো সম্ভব ; বিশেষতঃ যদি একে ধাতু বা ধাতুসংকর গলানো ও ঢালাই-এর কাজে ব্যবহার করা যায়। এছাড়া উচ্চ তাপমাত্রায় ঝালাই-এর কাজে (**welding**) এবং বিশুদ্ধ সিঙ্গল ক্রিষ্টাল গঠনেও ফার্নেসের ব্যবহার রয়েছে। গবেষণাগারে অধিক তাপমাত্রা সংক্রান্ত কাজে এর একাধিক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। সম্প্রতি মহাকাশ গবেষণাতেও সৌরচুল্লী ব্যবহারের কথা চিন্তা করা হচ্ছে।

অন্যান্য সৌর পদ্ধতিগুলির মতো এরও অবধারিত ত্রুটি হল রাতে বা সূর্যের অনুপস্থিতিতে এটি অকেজো হয়ে পড়ে। তাছাড়া বাতাসে ধূলোবালি, ধোঁয়া, কুয়াসা থাকাও বাঞ্ছনীয় নয়—চাই ঝকঝকে রোদ। এই জন্যে সাধারণতঃ কোনও উঁচু জায়গায় এটিকে স্থাপন করা হয়। এছাড়া বায়ুপ্রবাহের বেগের ওপরেও এর কার্যকারিতা নির্ভর করে। তবে সবচেয়ে বড় বাধা হল এর প্রাথমিক নির্মাণ ব্যয়।

সৌরশক্তি চালিত ইঞ্জিন ঃ

তাপ ইঞ্জিনের উদ্দেশ্য হল তাপকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা। এর ব্যবহারের সূত্রপাত ঘটে **1712** খ্রীষ্টাব্দে নিউকমেনের (**Newcomen**) বাষ্পচালিত পাম্পের আবিষ্কার এবং পরবর্তীকালে জেমস ওয়াটের বাষ্প ইঞ্জিনের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে। **1824** খ্রীষ্টাব্দে আটাশ বছরের ফরাসী

বিজ্ঞানী কার্নো (Carnot) তাত্ত্বিক উপায়ে তাপ ইঞ্জিনের দক্ষতা বার করেন। বাষ্প ইঞ্জিনের স্থানে সৌর ইঞ্জিনের ব্যবহারের প্রচেষ্টা সাম্প্রতিক ঘটনা নয়। সহজেই অনুমান করা যায় যে, সৌর ইঞ্জিনের ক্ষেত্রে জ্বালানী হল সূর্যের আলো। সুতরাং এক্ষেত্রে কোনও জ্বালানী খরচ নেই। বিভিন্ন ধরনের সৌর ইঞ্জিন গড়ে তোলা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা ষষ্ঠ অধ্যায়ে করা হবে। অনেকের মতে এর ভবিষ্যৎ খুবই সম্ভাবনাময়।

সমুদ্র জল থেকে তাপ ঃ

সৌর কারিগরী বিস্তার (Solar Technology) একটি বিস্ময়কর অবদান হল সমুদ্র জলের তাপ থেকে শক্তি উৎপাদন বা OCEAN THERMAL ENERGY CONVERSION ('ওটেক')। যদিও আজ থেকে একশ' বছরেরও আগে অর্থাৎ 1881 সালে ডি. আর্সোনভাল (D. Arsonval) প্রথম এই সম্ভাবনার কথা জানান। পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত করার জন্য পরবর্তীকালে বহু প্রচেষ্টা চালানো হয়। কিন্তু অর্থনৈতিক অসুবিধা ও কারিগরিক ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যে তা অবশেষে পরিত্যক্ত হয়। 1960 সালে অ্যাণ্ডারসন (Anderson) 'ওটেক' গবেষণায় নতুনভাবে আলোকপাত করেন। এর পর সত্তরের দশকে এ বিষয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে দেখা যায় যে সৌরশক্তির পরোক্ষ উৎসগুলির মধ্যে এই পদ্ধতিটি সবচেয়ে সম্ভাবনাপূর্ণ, কারণ এর সাহায্যে স্বল্পতম ব্যয়ে প্রচুর পরিমাণে শক্তি উৎপাদন করা সম্ভব। কিন্তু বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কমিশনের বারংবার সুপারিশ সত্ত্বেও নানা কারণে 'ওটেক' এতদিন ধরে অবহেলিত হয়ে এসেছে। তবে ইদানীং এর উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। এরই ফলে পৃথিবীর সর্বত্র ও বিশেষ করে আমেরিকায় এ বিষয়ে নানান গবেষণামূলক কাজ জোর কদমে এগিয়ে চলেছে। 2000 সাল নাগাদ আমেরিকায় বছরে 10^{17} জুল পরিমাণ শক্তি এই পদ্ধতিতে উৎপাদনের পরিকল্পনা করা হয়েছে এবং এই পরিমাণ 2020 সাল নাগাদ আরও 4×10^{18} জুল পরিমাণ বাড়ানো যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

এবার দেখা যাক 'ওটেক' পদ্ধতিতে কিভাবে শক্তি পাওয়া যায়। প্রথমেই বলে রাখি, পদ্ধতিটি উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে এবং বিশেষতঃ বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণে 20 ডিগ্রী অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অঞ্চলের জন্যে বিশেষভাবে উপযোগী। এই সব জায়গায় সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় 100 মিটার গভীরতা পর্যন্ত স্বাভাবিক গড়

তাপমাত্রা 28 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থাকে। এই তাপমাত্রা গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে কমতে থাকে এবং এক সময়ে (1000 মিটার গভীরতায়) 5 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডে দাঁড়ায়। তাপমাত্রার এই পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে টার্বোজেনারেটারের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। পদ্ধতিটি সহজ। উত্তপ্ত জলকে বাষ্পায়ন কক্ষে চালনা করে একটি তরলকে বাষ্পীভূত করা হয়। এইবার ঠাণ্ডা জল পাঠিয়ে এই বাষ্পকে কণ্ডেন্সারে ঘনীভূত করা হয়। এইভাবে বাষ্পচাপের একটা পার্থক্য গড়ে ওঠে। ফলে বাষ্পায়ন কক্ষ থেকে বাষ্প কণ্ডেন্সারের দিকে ধাবিত হয়। এই যাওয়ার পথে বাষ্পকে একটা টার্বাইনের ভেতর দিয়ে চালনা করা হয়। এর ফলে বাষ্পের তাপশক্তি যান্ত্রিক শক্তিতে পরিবর্তিত হয় এবং টার্বোজেনারেটারকে সহজেই চালাতে সক্ষম হয়। এবার ঘনীভূত তরলকে কণ্ডেন্সার থেকে বাষ্পায়ন কক্ষে পাঠিয়ে চক্র সম্পূর্ণ করা হয়। শীতক হিসাবে তরল অ্যামোনিয়ার ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় 'ওটেক'-এ একটা বাড়তি সুবিধা আছে। এই পদ্ধতিতে বছরে সমস্ত ঋতুতে দিনরাত অবিরাম বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। কেননা উষ্ণমণ্ডলীয় অঞ্চলে ঋতুর পরিবর্তন সমুদ্রের সুবিশাল তাপ ভাণ্ডারে সামান্যই হেরফের ঘটাতে পারে। গ্রীষ্মকালে বিদ্যুতের চাহিদা স্বভাবতই বেশি থাকে এবং এই সময়ে 'ওটেকের' উৎপাদন ক্ষমতাও বেড়ে যায় (সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য গ্রীষ্মে বেশি হয় বলে)। আবার শীতকালে উৎপাদন ক্ষমতা কমে গেলেও বিদ্যুতের স্বাভাবিক চাহিদা কম থাকায় পুষিয়ে যাওয়া সম্ভব। কিন্তু শুধুমাত্র সম্ভাবনার ইঙ্গিত বাণিজ্যিক গুরুত্ব বাড়াতে পারে না। এর জন্যে দরকার ব্যাপক গবেষণার মাধ্যমে এর অর্থনৈতিক ও কারিগরী সাফল্য সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা পুরোপুরি দূর করা।

সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ

"In one second the sun radiates more energy than man has ever used"
—*National Geographic.*

অর্ধ-পরিবাহী পদার্থ বা সেমিকণ্ডাক্টর ঃ

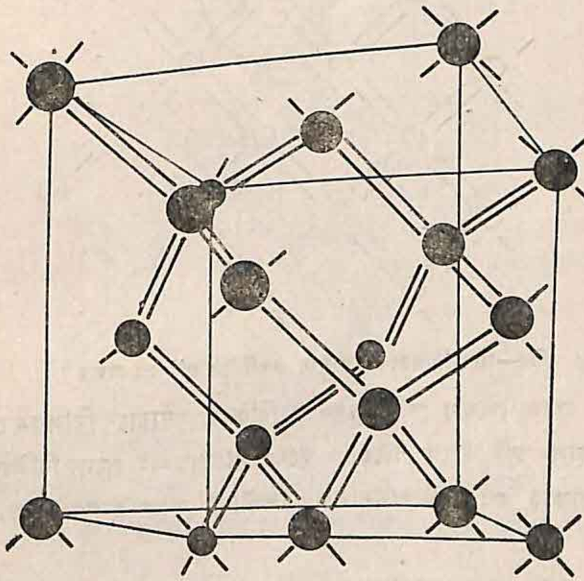
সূর্যের আলো থেকে সরাসরি বিদ্যুৎ তৈরী করার যে সব ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে ফটোভোল্টেইক (**photovoltaic**) কোষ বা সৌর কোষের নাম প্রথমেই করা যায়। এই সব কোষ গঠনের মূল উপাদান হল অর্ধ-পরিবাহী পদার্থ বা সেমিকণ্ডাক্টর। তাই সৌরকোষ সম্বন্ধে আলোচনা করার আগে সেমিকণ্ডাক্টারের বিষয়ে দু-চার কথা বলা প্রয়োজন।

আমরা জানি যে বেশিরভাগ কঠিন পদার্থের ক্ষেত্রে তার সংগঠক কণাগুলি (অণু, পরমাণু বা আয়ন) একটি নিয়মিত জ্যামিতিক আকৃতিতে সজ্জিত থাকে। এরই নাম কেলাস বা ক্রিস্টাল। নুন, চিনি, বালি, প্রভৃতি বিভিন্ন পদার্থ কেলাসিত অবস্থায় থাকে। তামা, লোহা, দস্তা প্রভৃতি ধাতুও কেলাসিত অবস্থায় থাকে। তবে ধাতুর কেলাসের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এক্ষেত্রে সংগঠক পরমাণুদের মাঝের শূন্য জায়গাগুলোতে থাকে পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসা মুক্ত ইলেকট্রন। ঠিক যেন ইলেকট্রনের সমুদ্রে অসংখ্য ধনাত্মক আয়নের দ্বীপ। এই জন্যে ধাতুর বিদ্যুৎ পরিবহণের ক্ষমতা রয়েছে।[1] অর্ধ-পরিবাহী পদার্থে স্বভাবতই এই মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা খুব কম। অর্ধ-পরিবাহী পদার্থদের মধ্যে অন্যতম হল সিলিকন। বালির মূল উপাদান এই সিলিকনের ভাণ্ডার প্রকৃতিতে অফুরন্ত।

সিলিকন কেলাসে (চিত্র—15) প্রতিটি সিলিকন পরমাণু অপর চারটি পরমাণুকে সমযোজী বন্ধনীর (**covalent bonding**) সাহায্যে ধরে রাখে। এই জাতীয় প্রত্যেক বন্ধনীতে অংশগ্রহণকারী পরমাণু সংখ্যা দুটি। এরা প্রত্যেকে বন্ধনীর প্রয়োজনীয় ইলেকট্রন সরবরাহ করে ও সমানভাবে ভোগ করে।

1. ধাতুদের তড়িৎ পরিবহণ ক্ষমতার এই ব্যাখ্যা সর্বাপেক্ষা সহজ হলেও আধুনিকতম নয়

দেখা গেছে যে, পরম শূন্য তাপমাত্রা[1] ভিন্ন অন্য যে কোনও তাপমাত্রায় কেলাসের পরমাণুগুলি তাপজনিত কম্পন অনুভব করে এবং এই কম্পন তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। এই কম্পন যথেষ্ট মাত্রায় হলে কেলাসের মধ্যে কোন কোন সমযোজী বন্ধনীতে ভাঙন ধরে ও বন্ধনীর ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ফাঁকা আন্তঃপারমাণবিক জায়গাগুলো (interatomic space)

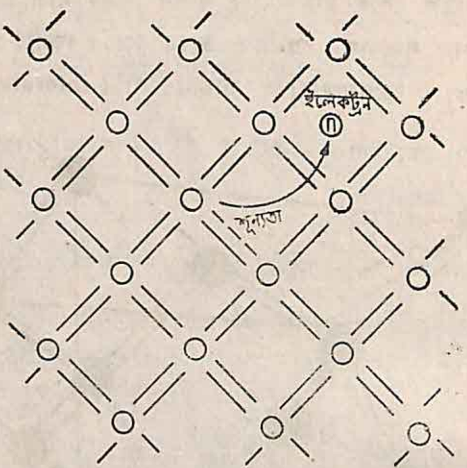


চিত্র—15 : সিলিকনের একটি কেলাস। প্রতিটি সিলিকন পরমাণু প্রতিবেশী চারটি সিলিকনের সঙ্গে বাঁধা থাকে, ফলে সৃষ্টি হয় সিলিকনের অতিকায় এক অণু। গোটা কেলাসটিই এখানে একটিমাত্র অণু।

দখল করে। ফলে বন্ধনীর ঐ নির্দিষ্ট স্থানটিতে ইলেকট্রন শূন্যতা (hole)-এর সৃষ্টি হয় (চিত্র—16)। এই "হোল্" একটি ধনাত্মক আয়নের মতো ব্যবহার করে। ফলে তড়িৎ বিভব প্রয়োগ করলে হোল্ ইলেকট্রনের বিপরীত দিকে ধেয়ে যায়। পাশাপাশি বন্ধনীতে নতুন ইলেকট্রন-হোল্ সৃষ্টি হয় ও ইলেকট্রন আদানপ্রদানের মাধ্যমে প্রক্রিয়াটি সম্পন্ন হয়। স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সেমিকণ্ডাক্টরে এই ইলেকট্রন-হোল্ খুবই

1. হিমাঙ্কের চেয়ে 273 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কম তাপমাত্রা।

কম সংখ্যায় থাকে। বিশুদ্ধ সিলিকনে প্রায় প্রতি এক লক্ষ কোটি পরমাণুতে একটিমাত্র ইলেকট্রন-হোল্ সৃষ্টি হয়। তবে দেখা গেছে যে 1100 ন্যানোমিটারের

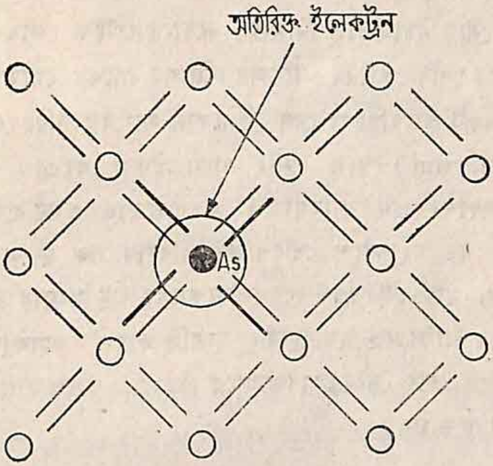


চিত্র—16 : সিলিকনের কেলাসে একটি "হোল্" সৃষ্টি হয়েছে

চেয়ে ছোট তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের তড়িৎ-চুম্বকীয় বিকিরণ অনায়াসে সিলিকন কেলাসে ইলেকট্রন-হোল্ সৃষ্টি করতে পারে। সূর্যের আলোয় এই ধরনের বিকিরণ প্রচুর পরিমাণে থাকায় এর সাহায্যে সিলিকন ক্রিস্টালে প্রচুর ইলেকট্রন-হোল্ সৃষ্টি করা সম্ভব।

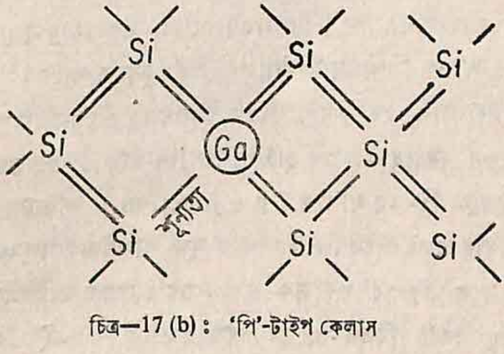
এবার দেখা যাক কেলাসের অশুদ্ধি (impurity) কিভাবে তড়িৎ পরিবহনকে প্রভাবিত করে। দেখা গেছে যে অতি বিশুদ্ধ সিলিকন কেলাসেও প্রতি এক হাজার কোটি পরমাণুতে একটি অন্য মৌলের পরমাণু ঢুকে থাকে। 17 নং চিত্রে একটি আর্সেনিক পরমাণুকে সিলিকন ক্রিস্টালের অশুদ্ধি হিসেবে দেখানো হয়েছে। আর্সেনিকের বাইরের কক্ষে থাকে পাঁচটি ইলেকট্রন। এর মধ্যে চারটি ব্যয়িত হয় প্রতিবেশী সিলিকনের সঙ্গে সমযোজী বন্ধনী গড়ে তুলতে। বাকি ইলেকট্রনটি আর্সেনিক পরমাণুর সঙ্গে দুর্বলভাবে যুক্ত থাকে। ফলে স্বাভাবিক তাপমাত্রাতেই এই ইলেকট্রন আর্সেনিক পরমাণু থেকে বেরিয়ে আসে। কিন্তু এক্ষেত্রে ধনাত্মক আর্সেনিক আয়ন বা হোল্টি কেলাসের মধ্যে দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। ফলে শুধুমাত্র মুক্ত ইলেকট্রন তড়িৎ পরিবহণে অংশ নেয়। ইলেকট্রন ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত (negatively charged) বলে এই

ধরণের কেলাসকে "এন-টাইপ" (n-type) বলে। আবার বাইরের কক্ষে তিনটি ইলেকট্রন আছে এমন পরমাণু, যেমন, বোরোন গ্যালিয়াম ইত্যাদি সিলিকন কেলাসে থাকলে তার ফল দাঁড়ায় অন্যরকম। এক্ষেত্রে বিজাতীয় পরমাণুটি



চিত্র—17 (a) : 'এন'-টাইপ কেলাস

পাশের কোনও বন্ধনী ভেঙে তার প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত ইলেকট্রনটি সংগ্রহ করে এবং নিজে ঋণাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয়ে কেলাসের কাঠামোতে আটকে থাকে



চিত্র—17 (b) : 'পি'-টাইপ কেলাস

(17 (b) নং চিত্র)। ফলে এক্ষেত্রে শুধুমাত্র পজিটিভ হোল্‌টি তড়িৎপরিবহণে অংশ নেয়। তাই এই ধরনের কেলাসকে "পি-টাইপ" (p-type) কেলাস বলে। সুতরাং কেলাসের প্রকৃতি নির্ধারণে অশুদ্ধির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

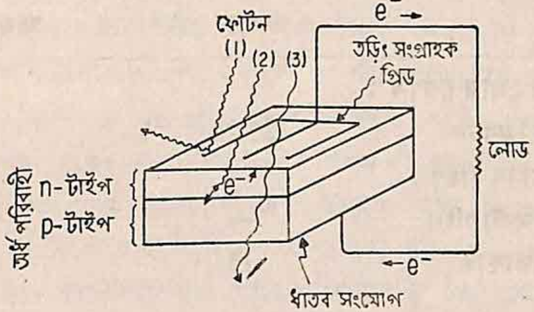
সৌর কোষ বা ফটোভোল্টেইক কোষ ঃ

প্রায় দেড়শ 'বছর আগে অর্থাৎ 1839 সালে এড্‌মণ্ড বিকুইরেল (Edmond Becquerel) প্রথম তড়িৎ কোষে ফটোভোল্টেইক ক্রিয়া লক্ষ্য করেন। এর পর 1877 সালে আডাম্‌স্ (W. G. Adams) ও ডে (R. E. Day) একটি সলিড স্টেট (সেলেনিয়াম ধাতু নির্মিত) ফটোভোল্টেইক কোষ তৈরী করেন। সিলিকন নির্মিত সৌর কোষের আবিষ্কার চল্লিশের দশকের গোড়ার দিকে হলেও এর নয়া সংস্করণটি আমেরিকার বেল টেলিফোন ল্যাবোরেটরির জেরাল্ড পিয়ার্সন (G. L. Pearson) মাত্র 1951 সালে তৈরী করেন। 1958 সালে আমেরিকার মহাকাশযান "ভ্যান্‌গার্ড 1"-এ সৌরকোষ প্রথম ব্যবহার করা হয়। এই সাফল্যের পর মহাকাশে সৌরশক্তির ব্যবহার শুরু হয় একচেটিয়াভাবে। শুধু তাই নয়, গত দুই দশক ধরে সৌরকোষের এই ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়ে গিয়ে আজ হয়ে দাঁড়িয়েছে অপরিহার্য। সম্প্রতি ভারতীয় মহাকাশযান অ্যাপ্‌ল্ মহাকাশে গিয়ে তার সৌর-কোষগুলোকে ঠিকমতো কাজে লাগাতে না পারায় বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল।

সৌরকোষ সাধারণতঃ সিলিকন কেলাসের একটি ছোট অতি পাতলা অংশ (1 সেমি × 2 সেমি × 4 মিমি), যাতে পি- এবং এন- দুটি স্তরই গড়ে তোলা হয়। এর বাইরের তলগুলি থাকে মসৃণ। এই মসৃণ তল থেকে প্রতিফলনের ফলে কোষে রশ্মির শোষণের পরিমাণ যাতে না কমে সেজন্যে দেওয়া হয় প্রতিফলনরোধকারী প্রলেপ (antireflection coating)। ফলে বেশি পরিমাণ সূর্যের আলো সিলিকন ক্রিস্টালের ভেতর ঢুকতে পারে।

এখন আমরা জানি যে, এন-স্তরে বেশি সংখ্যায় ও পি-স্তরে খুব কম সংখ্যায় ইলেকট্রন থাকে। কোষে এই স্তর দুটি পাশাপাশি থাকায় এন-স্তর থেকে ব্যাপন প্রক্রিয়ায় ইলেকট্রন পি-এন সীমান্ত (p-n junction) অতিক্রম করে পি-স্তরে ঢোকে। আবার একইভাবে পি-স্তর থেকে মুক্ত পজিটিভ হোল্ এন-স্তরের দিকে ধেয়ে যায়। ফলে পি-স্তর ঋণাত্মক ও এন-স্তর ধনাত্মক তড়িৎগ্রস্ত হয়ে পি-এন সীমান্ত বরাবর একটি বিভব প্রভেদ গড়ে তোলে। এই বিভব প্রাচীরই (potential barrier) আবার অতিরিক্ত ইলেকট্রন প্রবাহকে অর্থাৎ এই ব্যাপন প্রক্রিয়াকে বাধা দেয়। কিন্তু শক্তিশালী আলোর কণা বা ফোটোন-এর প্রভাবে সৃষ্ট ইলেকট্রন হোল্ জুড়িকে এ সহজেই পৃথক করতে পারে। কারণ, এই বিভব

প্রভেদের প্রভাবে পজিটিভ হোল্ পি-স্তরের দিকে ও ইলেকট্রন এন-স্তরের দিকে আকৃষ্ট হয়। ফলে সৃষ্টি হয় তড়িৎচালক বল। এবার পি- ও এন-স্তরকে পরিবাহী তার দিয়ে যুক্ত করলে তারের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হতে থাকবে (চিত্র—18)।



চিত্র—18 : সৌরকোষের মূলনীতি

সৌরকোষে প্রতিফলনরোধী আস্তরণ থাকা সত্ত্বেও আপতিত রশ্মির বেশ কিছুটা প্রতিফলনের ফলে নষ্ট হয়। এছাড়া কিছু রশ্মি প্রতিসৃত হয়ে বেরিয়ে যায় আর কিছুটা রূপান্তরিত হয় তাপে। ফলে সৌরকোষ আপতিত কিরণের বড় জোর কুড়ি শতাংশকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করতে পারে। ডিজেল ইঞ্জিনের কার্যকারিতার শতকরা পরিমাণও প্রায় একই।

প্রতি সিলিকন সৌরকোষের তড়িৎচালক বলের পরিমাণ 0·65 ভোল্ট। কার্যক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংখ্যক এই ধরণের কোষকে শ্রেণী ও সমান্তরাল সজ্জায় রেখে নির্দিষ্ট মাত্রায় বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। এক বর্গমিটার জুড়ে এক সৌরকোষের সজ্জাকে সূর্যের দিকে মেলে ধরলে তা থেকে 200 ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। সৌরকোষের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যে নানান ধরণের চেষ্টা চলেছে।

এছাড়া নতুন নতুন সেমিকণ্ডাক্টারের আবিষ্কার ও সৌরকোষে তাদের ব্যবহারের চেষ্টা চলেছে। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় ক্যাড্‌মিয়াম্ সালফাইড, গ্যালিয়াম আর্সেনাইড, পলিক্রিস্টালাইন সিলিকন, অনিয়তাকার (amorphous) সিলিকন ইত্যাদি। নীচের তালিকায় এদের নাম এবং তা-থেকে তৈরী সৌরকোষের ক্ষমতা দেওয়া হল। এ ছাড়াও বহুপ্রকার সৌরকোষ আজ আমাদের জানা। জিংক ফস্‌ফাইড, ক্যাড্‌মিয়াম টেলুরাইড,

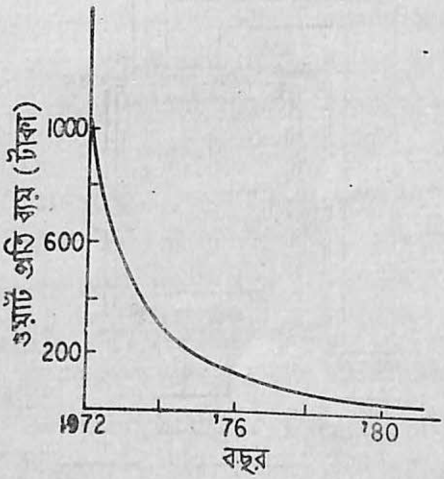
জিংক-সিলিকন আর্সেনাইড, কিউপ্রাস্ অক্সাইড এমনকি পলি-অ্যাসিটিলিনকেও সৌরকোষের উপাদান হিসেবে ব্যবহার করার চেষ্টা চলেছে।

সেমিকণ্ডাক্টার	সর্বোচ্চ প্রাপ্য ক্ষমতা (%)	সর্বোচ্চ প্রাপ্ত ক্ষমতা (%)
সিলিকন সৌর-কোষ :		
সিঙ্গল ক্রিস্টাল (পিয়ার্সন টাইপ)	20-22	19
পলি-ক্রিস্টালাইন	—	7·4
অনিয়তাকার	15	6·5
অন্যান্য		
ক্যাড্মিয়াম সালফাইড/ কিউপ্রাস্ সালফাইড	15	8·6
ক্যাড্মিয়াম সালফাইড/ কপার-ইন্ডিয়াম সেলেনাইড	24	12
গ্যালিয়াম আর্সেনাইড	28	14
ক্যাড্মিয়াম-জিংক সালফাইড/ কিউপ্রাস্ সালফাইড	15	6·3
সিঙ্গল-ক্রিস্টাল সিলিকন/ ইন্ডিয়াম-টিন অক্সাইড	20	12

সৌর বিদ্যুতের বিভিন্ন সুবিধার দিকগুলো হল : (1) এর উৎপাদনে জ্বালানী খরচ নেই। অথচ তাপবিদ্যুতে প্রচুর জ্বালানী খরচ রয়েছে। এইভাবে খরচ বাঁচিয়ে জীবাশ্ম জ্বালানীর সীমিত প্রাকৃতিক ভাণ্ডারটিকে বেশিদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব। (2) এখানে গ্যাস বা ধোঁয়া সৃষ্টির প্রশ্নই ওঠে না। তাই বায়ুমণ্ডল বা পরিবেশ দূষিত হয় না। তাছাড়া এক্ষেত্রে বিরক্তিকর কোনও যান্ত্রিক শব্দও নেই। (3) প্রাথমিক খরচা অর্থাৎ বসানোর খরচা তুলনামূলকভাবে অন্যের চেয়ে কিছু বেশি হলেও এর রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতির ব্যয়ভার খুবই নগণ্য। (4) আর একটি বিশেষ সুবিধা হল এই যে, এর উৎপাদন ব্যয়ের হার স্বল্প পরিমাণ

উৎপাদনের ক্ষেত্রে যা বৃহদাকার উৎপাদনের ক্ষেত্রেও তাই। ফলে উৎসকে বিকেন্দ্রীভূত করে ছোট ছোট ইউনিটে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব। তাই শহর থেকে বহু দূরে কোনও বিচ্ছিন্ন গ্রামে-গঞ্জে যেখানে তার টাঙিয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, সেখানেও এইভাবে ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ সহজে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে দেশের এক সামান্য অংশমাত্র বৈদ্যুতিকরণ করা সম্ভব হয়েছে, সেখানে এর বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে।

প্রকৃতিতে সিলিকনের এই প্রাচুর্য আর সিলিকন কোষের এমন সহজ ও সফল কার্যকুশলতা সত্ত্বেও মহাকাশযান ছাড়া অন্যত্র এর ব্যবহারিক প্রয়োগের পরিমাণ কিন্তু আজও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ভারতের মতো দেশে, যেখানে ভৌগোলিক অবস্থানের জন্যে সূর্যের আলো রয়েছে প্রচুর পরিমাণে, সেখানেও যে এমনটি ঘটছে তার প্রধান কারণ হল কোষে ব্যবহারযোগ্য উন্নতমানের বিশুদ্ধ সিলিকন তৈরী করার প্রচণ্ড ব্যয়সাপেক্ষ পদ্ধতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 1958 সালে

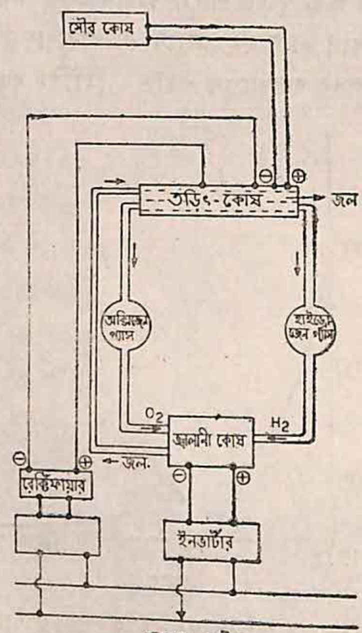


চিত্র—19 : বিগত বছরগুলিতে সৌরকোষের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যয় দ্রুত কমছে। অদূর ভবিষ্যতে এই ব্যয় তাপবিদ্যুৎ ও পারমাণবিক বিদ্যুতের উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারবে বলে আশা করা যায়

সিলিকন সৌরকোষের সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে খরচ পড়েছিল প্রতি কিলো ওয়াটে দু'লক্ষ ডলারের মতো। এখন এই খরচ কমে দাড়িয়েছে 20 হাজার ডলারে। উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গত দুই দশক ধরে সৌরকোষ

নির্মাণের খরচ যে ভাবে কমেছে তা উপরের লেখচিত্রের (চিত্র—19) সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। বর্তমানে ভারতে ফটোভোল্টেইক বিদ্যুতের প্রতি সর্বোচ্চ-ওয়াটে (peak watt) খরচ পড়ে এক শ' টাকা। অথচ তাপ বিদ্যুৎ ও পরমাণু বিদ্যুতে এই খরচ দাঁড়ায় যথাক্রমে পাঁচ ও দশ টাকা।

সমস্যা আরও আছে। এই পদ্ধতিতে ব্যবহারযোগ্য মাত্রায় বিদ্যুৎ পেতে হলে এক বিরাট অঞ্চল জুড়ে কোষসজ্জা গড়ে তুলতে হবে। তাই পদ্ধতিটি একাধারে যেমন ব্যয়সাপেক্ষ তেমনই অন্য দিকে এতে প্রচুর জায়গার দরকার। ইদানীং বিভিন্ন ধরনের প্রতিফলক ব্যবহার করে সূর্যের আলোকে কেন্দ্রীভূত করে প্রতি একক ক্ষেত্রে বর্ধিত মাত্রায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছে।



চিত্র—20 : সৌরকোষে উৎপাদিত বিদ্যুতের সঞ্চয়ের জন্যে জ্বালানী কোষের ব্যবহার

পৃথিবীর নিজস্ব গতিও এই উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বড় বাধা। বার্ষিক গতির ফলে বিভিন্ন ঋতুতে আপতিত সৌরকিরণের তীব্রতার হেরফের ঘটে। এদিকে আহ্নিক গতির জন্যে পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত হয়। রাতের বেলায় আলোর অভাবে উৎপাদন বন্ধ থাকে। এই অসুবিধা দূর করার জন্যে সঞ্চয়ক

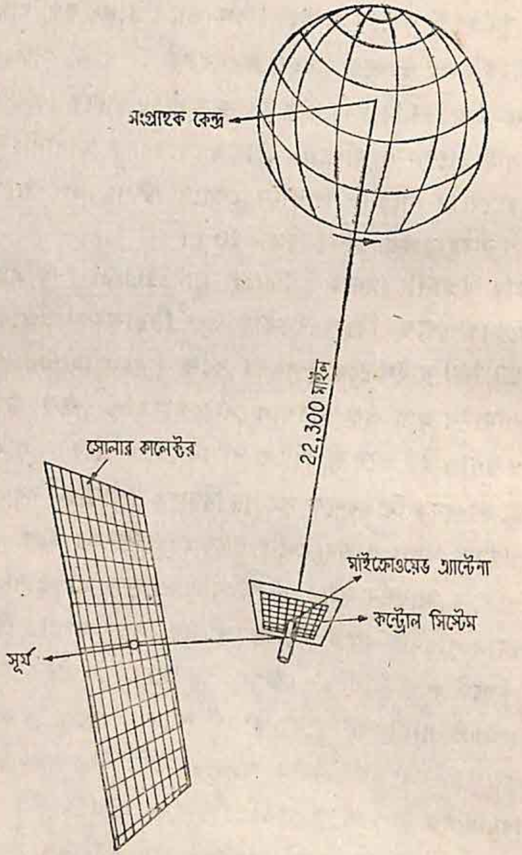
কোষ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দিনের বেলায় সৌরকোষ যতটা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তা এই কোষে সঞ্চিত রেখে প্রয়োজনমতো রাতের দিকে বা মেঘলা দিনে তা থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। সাধারণ সঞ্চয়ক কোষের মধ্যে লেড-অ্যাসিড় কোষ ও ইদানীং লিথিয়াম-ক্লোরিন, সোডিয়াম-সালফার, জিংক-অক্সিজেন (বায়ুমণ্ডল) কোষের ব্যবহার বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়। সম্প্রতি জ্বালানী কোষকেও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হচ্ছে। যেমন, সৌরকোষে উৎপন্ন বিদ্যুৎ দিয়ে জলের তড়িৎ বিশ্লেষণ করে উৎপন্ন করা হয় হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস। এই হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস প্রয়োজনমত জ্বালানীকোষে পাঠিয়ে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা যেতে পারে। জ্বালানী কোষে উৎপন্ন জল আবার পরবর্তী তড়িৎ বিশ্লেষণে ব্যবহার করা যায় (চিত্র—20)।

আমেরিকার বিজ্ঞানী গ্লেসার (Peter E. Glaser) কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে সৌরকোষ থেকে বিদ্যুৎ তৈরীর এক চিত্তাকর্ষক প্রস্তাব করেছেন। পৃথিবী থেকে 22,300 মাইল দূরে ভূ-সমলয় কক্ষে (geostationary orbit), স্থাপিত পাঁচ বর্গমাইল জুড়ে এক সুবিশাল সৌরকোষসজ্জা থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ মাইক্রোওয়েভে রূপান্তরিত করে পৃথিবীতে পাঠান যেতে পারে। পৃথিবীর গ্রাহক কেন্দ্রে এই মাইক্রোওয়েভ বিকিরণকে পুনরায় বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে এক কোটি কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। ভূ-সমলয় কক্ষে থাকায় এটি পৃথিবীকে যে গতিতে আবর্তন করবে তা পৃথিবীর আহ্নিক গতির সমান। ফলে উপগ্রহটি ঘুর্ণায়মান পৃথিবীর একটি নির্দিষ্ট স্থানের ওপর আপাতঃস্থির থাকবে। ঐ স্থানে গড়ে তুলতে হবে রিসিভিং স্টেশন বা গ্রাহক কেন্দ্রটি (চিত্র—21)। এই সৌর প্যানেলটি সারাক্ষণই সূর্যের আলো পাবে। ফলে 24 ঘণ্টাই বিদ্যুৎ পাওয়া যেতে পারে। গ্লেসারের হিসেব অনুযায়ী প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুতের খরচ পড়বে পারমাণবিক উৎস থেকে পাওয়া বিদ্যুতের মাত্র দ্বিগুণ।

সৌরকোষের এমনি নানান সুবিধা অসুবিধার মধ্যে পরিবেশ দূষণের প্রশ্নটি আলোচনার দাবী রাখে। প্রথম দিকে ধারণা ছিল সৌরশক্তির ব্যবহারে পরিবেশ দূষণের কোন ভয় নেই। ইদানীং কিন্তু বিচার করে দেখা যাচ্ছে যে অপ্রত্যক্ষভাবে দূষণের সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। প্রথমতঃ সৌর-কোষের এখনও পর্যন্ত মূল উপাদান যে সিলিকন তার সংস্পর্শে সিলিকোসিস্ নামে এক মারাত্মক ব্যাধির সৃষ্টি হয়। সোলার সিলিকন সেল প্রস্তুতকারক

সংস্থার কর্মীদের মধ্যে এই রোগ ইদানীং স্বাভাবিকের চাইতে অনেক বেশি মাত্রায় ঘটতে দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয়তঃ, সৌরকোষসজ্জা বসাতে বিপুল পরিমাণ জায়গার দরকার। এর ফলে অন্যান্য নানান অসুবিধা ছাড়াও একটি মারাত্মক অসুবিধা দেখা দিতে

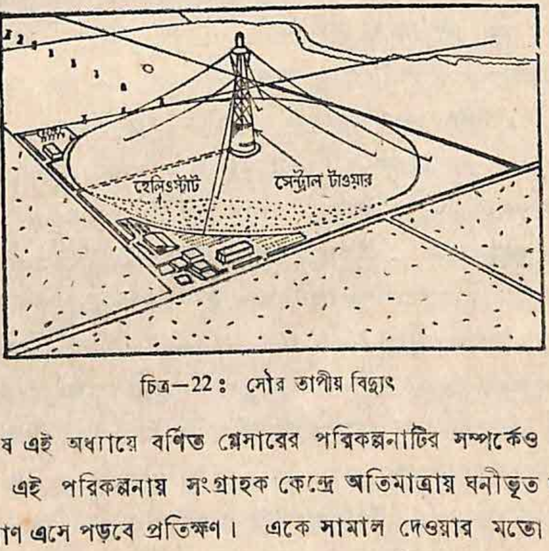


চিত্র—21 : গ্লেসারের পদ্ধতিতে সূর্যালোক থেকে বিদ্যুৎ

পারে। যেখানে এসব কোষ বসান হবে, সেখানকার মাটিতে রোদ্দুর পড়বে না। সৌরালোককে সৌরকোষ সজ্জার উপর শুষে নেওয়া হবে। ফলে পৃথিবীর মাটি, জল, গাছপালায় প্রতিফলিত হয়ে যে আলো, তাপ আবার আকাশে ফেরৎ যেত তার পরিমাণ কমে যাবে। অর্থাৎ পৃথিবীর প্রতিফলনাঙ্ক বা আলবেডো (পৃঃ 9 দ্রষ্টব্য) হ্রাস পাবে।

উন্নত দেশগুলির পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী শতাব্দীর প্রারম্ভে তারা তাদের মোট শক্তি ব্যয়ের দশ শতাংশ সৌরশক্তি থেকে পেতে চাইছে। এ কাজে সৌরকোষ স্বাভাবিকভাবেই বিপুলভাবে ব্যবহৃত হবে। পৃথিবীর আল্‌বেডো এর ফলে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস পাওয়া অসম্ভব নয়। তা যদি হয় তবে পৃথিবীর তাপসাম্য গুরুতরভাবে বিঘ্নিত হবে। ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে।

সৌরকোষের কার্যকারিতা বাড়াতে প্রতিফলকের ব্যবহার হয়ে থাকে। জনবহুল স্থানে এ জাতীয় প্রতিফলক বসানো থাকলে, তাতে প্রতিফলিত রোদ হঠাৎ চোখে এসে পড়ে পথচারী বা যানবাহনের চালকের চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে এবং দুর্ঘটনা ঘটতে পারে।



চিত্র—22: সৌর তাপীয় বিদ্যুৎ

পরিশেষে এই অধ্যায়ে বর্ণিত গ্লেসারের পরিকল্পনাটির সম্পর্কেও কিছু বলা প্রয়োজন। এই পরিকল্পনায় সংগ্রাহক কেন্দ্রে অতিমাত্রায় ঘনীভূত শক্তির এক বিপুল পরিমাণ এসে পড়বে প্রতিক্ষণ। একে সামাল দেওয়ার মতো যথাযোগ্য ব্যবস্থা করা সহজ নয়। একটা খেলনা আতস কাঁচ দিয়েই যেখানে কাগজ, কাঠ পুড়িয়ে দেওয়া যায়, সেক্ষেত্রে ঘনীভূত বিপুল এই শক্তির নিয়ন্ত্রণে সামান্য ভুলেই সবকিছু জ্বলেপুড়ে যেতে পারে। তাছাড়া পৃথিবীর তাপসাম্য বিঘ্নিত হবার প্রশ্নটিও এক্ষেত্রে গুরুতর। অতিরিক্ত যে শক্তি সূর্য থেকে সংগ্রহ করে আমরা পৃথিবীতে নিয়ে আসবো, অন্যান্য ব্যবহৃত শক্তির মতই তারও শেষ পরিণতি তাপ শক্তিতে। এই অতিরিক্ত তাপ কোথায় যাবে!

অন্যান্য পদ্ধতি :

সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের অপরাপর পদ্ধতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সৌর তাপীয় বিদ্যুৎ (**Solar Thermal Electricity**, চিত্র—22) ।

এক্ষেত্রে, বহু সংখ্যক সমতল দর্পণ দ্বারা সূর্য রশ্মি প্রতিফলিত করে একটি উঁচুতে রাখা তরলাধার (**receiver**)-কে উত্তপ্ত করা হয়। সমতল দর্পণগুলি হেলিওস্ট্যাট পদ্ধতিতে (35 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) সূর্যের গতিপথ অনুসরণ করতে পারে। তরলাধারটিকে প্রতিফলিত রশ্মির কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করা হয়। উৎপন্ন তরলের বাষ্পকে ব্যবহার করে একটি র‍্যাংকিন (**Rankine**) জেনারেটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হয়।



সৌরশক্তি ও সালোকসংশ্লেষ

"জীবের সৃষ্টি ও স্থিতির মূল কারণ শক্তি"—উইলিয়াম্ ব্লেক

আলোর স্পর্শে উদ্ভিদের সবুজ দেহে জল ও কার্বন ডাই-অক্সাইড সম্মিলিত হয়ে রূপান্তরিত হয় শর্করা জাতীয় জৈব যৌগে। এই বিক্রিয়াটি যেন কোনও যাদুর গুণে সাবলীলভাবে যুগ যুগ ধরে প্রকৃতির রাজ্যে ঘটে চলেছে- সৃষ্টি হয়েছে সুন্দর বনানী, রঙ-বে-রঙের ফুল, ফল, শস্য ইত্যাদি।

সালোকসংশ্লেষের ক্রিয়াকৌশল :

সালোকসংশ্লেষ নামের আপাতঃ সরল এই বিক্রিয়াটির মূল কথা হল সৌরালোকের সাহায্যে এবং গাছের সবুজ কণা ক্লোরোফিলদের অনুঘটন প্রভাবে জলের বিশ্লেষণ। এর ফলে জলের অক্সিজেন মুক্ত হয় আর সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হাইড্রোজেন/ইলেকট্রন বিক্রিয়াক্ষেত্রে উপস্থিত CO_2 অথবা অন্য কোন অণুকে বিজারিত করে নতুন জৈব যৌগ তৈরী করে। বিষয়টি এ পর্যন্ত বোধগম্য হলেও এর বিস্তারিত খুঁটিনাটি আজও সঠিকভাবে জানা যায় নি। তবু যেটুকু এ পর্যন্ত জানা গেছে তার বিষয়ে সংক্ষিপ্ত কিছুটা আলোচনা এখানে করা যাক।

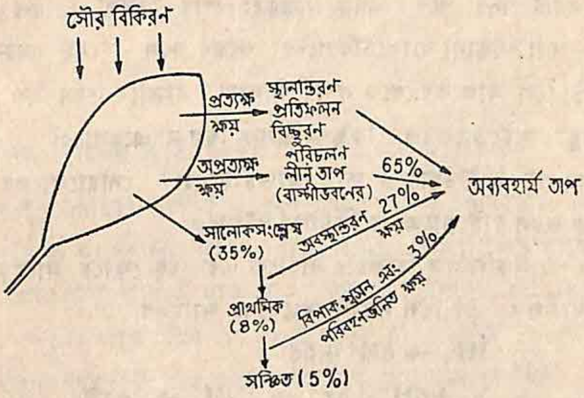
সূর্যের আলোর সঙ্গে যে গাছপালার একটা নিবিড় সম্পর্ক আছে, তা সুদূর অতীতেও মানুষের জানা ছিল। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতেই প্রথম এ বিষয়ে সুপরিকল্পিত গবেষণা হয়। ওই শতাব্দীর প্রথম ভাগে রসায়নবিদ ভান হেলমণ্ট (Van Helmont) সর্বপ্রথম দেখান যে গাছের বৃদ্ধির প্রয়োজনীয় সামগ্রী মাটি থেকে আসে না, আসে বাতাস, জল ও সূর্যের আলো থেকে। 1727 খ্রীষ্টাব্দে স্টিফেন হেলিস (Stephen Hales) প্রকাশ করেন "ভেজিটেব্‌ল্ স্ট্যাটিক্স" (*Vegetable Staticks*)—আলোক-রসায়নের সর্বপ্রথম বিজ্ঞান পত্রিকা। পরবর্তীকালে হেলিসের গবেষণার ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখেন প্রিস্টলে (Priestley), ইন্‌গেন হাউজ (Ingen-Housz), সেনেবিয়ার (Senebier) প্রমুখ বিজ্ঞানীরা।

ভারবুর্গ (Warburg), এমারসন (Emerson) প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেন যে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটি দুটি দশার সমষ্টি—আলোক দশা (light

phase) এবং আঁধার দশা (dark phase)। নামেই বোঝা যাচ্ছে যে আলোক দশার বিক্রিয়াগুলিতে আলোর প্রয়োজন (আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়া)। আঁধার দশার বিক্রিয়ায় আলোকশক্তির প্রয়োজন হয় না ; (রাসায়নিক দশা)। প্রথম দশার এই আলোক রাসায়নিক বিক্রিয়ার জন্য একান্ত প্রয়োজন হল ক্লোরোফিল নামের আলোক-সুবেদী পদার্থের। উদ্ভিদের সবুজ দেহকোষে, বিশেষ করে পাতার মেসোফিল কোষের ক্লোরোপ্লাস্ট নামক অংশে থাকে এই সবুজ রঞ্জক পদার্থ ক্লোরোফিল। উইল্স্টাটার (Wilstatar) ও স্টোলের (Stole) মতানুযায়ী এই রঞ্জক পদার্থটি আসলে ক্লোরোফিল-এ, ক্লোরোফিল-বি এবং বিভিন্ন ক্যারোটিনয়েড রঞ্জক পদার্থের সমন্বয়। প্রথম দুটি পদার্থ সবুজ হলেও পরেরগুলি কমলা-পীত রঙের। ক্লোরোফিল একটি ম্যাগনেসিয়াম ঘটিত যৌগ। এর রাসায়নিক ধর্মাবলী ও গঠনগত সংকেতও আজ বিজ্ঞানীরা বের করে ফেলেছেন। দেখা গেছে যে ক্লোরোফিল-এ ছাড়া আনুষঙ্গিক রঞ্জক পদার্থগুলি শক্তির রূপান্তরের ক্ষেত্রে সরাসরি অংশ গ্রহণ করে না। এরা গ্রাহক হিসেবে কাজ করে আলোর থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। এই সংগৃহীত শক্তিকে রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে ক্লোরোফিল-এ। প্রতিটি সালোকসংশ্লেষী ইউনিটে গ্রাহক থাকে প্রায় দুশ'টি ; কিন্তু শক্তির রূপান্তরকারী ক্লোরোফিল-এ থাকে মাত্র একটিই। এদেরই মিলিত ক্রিয়ায় ঘটে জারণ-বিজারণ বিক্রিয়া। ফলে সৃষ্টি হয় বিজারিত নিকোটিনামাইড এ্যাডেনাইন ডাইনিউক্লিওটাইড ফসফেট বা সংক্ষেপে NADPH এবং এ্যাডেনোসিন ট্রাইফসফেট (ATP) ; আর জল বিশ্লিষ্ট হয়ে রূপান্তরিত হয় অক্সিজেনে। 1907 সালে জৈব রসায়নবিদ রবিন হিল (Robin Hill) সর্বপ্রথম পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যে, আলো ও উপযুক্ত ইলেকট্রন গ্রাহকের (জারক) উপস্থিতিতে ক্লোরোফিল সত্যিই জল থেকে অক্সিজেন মুক্ত করতে পারে।

আলোক দশায় উৎপন্ন NADPH আর ATP এর পর আঁধার দশায় একাধিক জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উৎসেচকদের সহযোগিতায় কার্বন ডাই-অক্সাইডকে রূপান্তরিত করে কার্বোহাইড্রেড ও অন্যান্য জৈব যৌগে। অন্ধকার দশার শেষে NADPH এবং ATP ফিরে যায় পূর্বাবস্থায় (অর্থাৎ NADP এবং ADP-তে)। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় ক্যালিফোর্নিয়া

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদ্বয় কেল্‌ভিন (**Calvin**) এবং বেন্‌সন (**Benson**) কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বোহাইড্রেড তৈরীর জটিল রাসায়নিক প্রক্রিয়ার



চিত্র—23 : আদর্শ পরিবেশেও শোষিত আলোর সবটুকু গাছ কাজে লাগাতে পারে না। শোষিত শক্তি কি কি ভাবে নষ্ট হয় তাই এখানে দেখান হয়েছে

ওপর নতুনভাবে আলোকপাত করেন। এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য প্রফেসর কেল্‌ভিনকে 1961 খ্রীষ্টাব্দে রসায়নে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়।

তাত্ত্বিক বিচারে একটি আদর্শ পাতায় সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় শক্তির রূপান্তর ঘটতে পারে সর্বাধিক শতকরা 33 ভাগ। কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন বিশুদ্ধ লাল আলোর। তাই সাত রঙে মেশান সূর্যের আলোর ক্ষেত্রে এই দক্ষতা দাঁড়ায় মাত্র 10 –12 শতাংশ, কারণ মোট বিকিরণের অর্ধেকেরও বেশি অশোষিত থেকে যায়। তাছাড়া শোষিত আলোরও অনেকটাই ব্যবহারযোগ্য নয়। সর্বোপরি বাস্তবক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় শক্তিক্ষয়ের দরুন এই দক্ষতা আবার তাত্ত্বিক মানের চেয়ে অনেকাংশে কম হয়। উপরের ছবিতে (চিত্র—23) এই বিভিন্ন প্রক্রিয়াগুলি এবং সম্ভাব্য শক্তিক্ষয় দেখানো হয়েছে। এই ছকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে ভূপৃষ্ঠের সমস্ত অংশ আদর্শ পাতায় ঢাকা এবং সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াটিও ঘটছে আদর্শ পরিবেশে। এই দুটির কোনটিই বাস্তবে ঘটে না। তাই প্রক্রিয়াটির প্রকৃত দক্ষতা আরও কম হয়।

সালোকসংশ্লেষ ও বিবর্তনের ধারা ঃ

পৃথিবীতে সালোকসংশ্লেষের প্রথম সূচনা ঘটেছিল সূর্যের জন্মের প্রায় 170 কোটি বছর পরে, অর্থাৎ সম্ভবতঃ প্রায় তিনশ' তিরিশ কোটি বছর আগে—অবাতসন্ধানী ব্যাকটেরিয়াদের[1] জন্মের ফলে। সেই সময়কার পৃথিবীর চেহারাটা ছিল আজকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। বাতাসে তখন ছিল নাইট্রোজেন, ছিল কিছুটা হাইড্রোজেনও; কিন্তু অক্সিজেন ছিল না একেবারেই। এদেরই মধ্যে জন্ম নেয় এই ক্লস্ট্রিডিয়াম ও তার জাতভাইয়েরা। সৌরালোকের শক্তি দিয়ে এরা শুরু করল হাইড্রোজেনের বিভাজন ঘটাতে।

এর পর নিম্নলিখিত বিক্রিয়ার সাহায্যে এরা দেহ কোষে নাইট্রোজেন সঞ্চয় করতে থাকল। এই ছিল সালোকসংশ্লেষের আদিরূপ।

$$3H_2 \rightarrow 6H^+ + 6e^-$$

$$N_2 + 6H^+ + 6e^- \rightarrow 2NH_3 \rightarrow \text{প্রোটিন}$$

ক্লোরোফিলের স্তরযুক্ত ব্যাকটেরিয়াদের আবির্ভাব ঘটল প্রায় 310 কোটি বছর আগে। ক্লোরোফিল থাকায় এই ব্যাকটেরিয়াদের ক্ষমতা জন্মাল হাইড্রোজেন সালফাইডকে ইলেকট্রনের আর CO_2-কে কার্বনের উৎস হিসেবে ব্যবহার করবার। অর্থাৎ সম্পূর্ণ অজৈব উৎসকে ব্যবহার করে জৈব যৌগ সৃষ্টির সূচনা ঘটল।

$$H_2S \rightarrow 2H^+ + 2e^- + S$$

$$CO_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow \text{জৈব যৌগাদি}$$

ভূতাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আজ থেকে প্রায় 220 কোটি বছর আগে পৃথিবীতে মুক্ত অক্সিজেনের প্রাচুর্যের যুগ শুরু হয়েছিল। তবে তারও আগে কিছু পরিমাণ অক্সিজেন তৈরী হত জলের উপর অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে। তৎকালীন ব্যাকটেরিয়ারা সকলেই ছিল অবাতসন্ধানী; কাজেই অক্সিজেন ছিল তাদের কাছে বিষতুল্য। অতিবেগুনী রশ্মির প্রভাবে জলের সালোক বিশ্লেষণে অল্প স্বল্প যে অক্সিজেন তৈরী হতে থাকল তার প্রভাবে অক্সিজেন বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ক্ষমতা বিবর্তনের ধারায় ক্রমাগত এদের মধ্যে গড়ে উঠল। সৃষ্টি হল নীল-সবুজ শেওলাজাতীয় গুল্মদের (যেমন

1. যে ব্যাকটেরিয়া অক্সিজেনবিহীন পরিবেশে জন্ম নেয় ও বৃদ্ধি পায়; যেমন ক্লস্ট্রিডিয়াম (Clostridium)

অ্যানাবেনা, anabaena)। এরাই প্রথম জলের বিশ্লেষণে অক্সিজেন উদ্গিরণ এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে জৈব যৌগ সৃষ্টির সূচনা করল—অর্থাৎ সালোক-সংশ্লেষের বর্তমান রূপ দেখা দিল। এরই অন্যতম ফল, 120 কোটি বছর আগে জটিলতর জীবকুলের (এনক্যারিয়ট, enkaryote) জন্ম, আর তা থেকে প্রাণের বর্তমান রূপ।

সালোকসংশ্লেষের মাধ্যমে সৌরশক্তির ব্যবহার ঃ

সৌরশক্তি পরিমাণে প্রচুর। তবে বাস্তবক্ষেত্রে এর ব্যবহারে যথেষ্ট অসুবিধা আছে—একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আমরা দেখেছি যে সৌরশক্তি দিনের বেলায় ছাড়া পাওয়া যায় না। আবার মেঘলা আকাশেও সৌরশক্তির পরিমাণ গুরুতর ভাবে কমে যায়। তাছাড়া সৌর কিরণের বিক্ষিপ্ত চরিত্র এবং দিন ও ঋতুর পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সূর্যের দিক পরিবর্তন—এ সবই সৌরশক্তির ব্যবহারের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। এই সব কারণে সংগৃহীত শক্তির সঞ্চয় ব্যবস্থা আমাদের পদ্ধতিতে অপরিহার্য। প্রায়শঃই তা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। কিন্তু প্রকৃতির রাজ্যে এ সব কিছুরই স্বাভাবিক সমাধান হয়ে রয়েছে। গাছপালা অতি কঠোর আবহাওয়াতেও জন্মাতে পারে। মেঘলা দিনেও সালোকসংশ্লেষ চালাতে পারে। এইভাবে সংগৃহীত শক্তিকে নিজ দেহে সঞ্চয় করতেও জানে। যেদিকে আলো পায় সেদিকে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষমতাও গাছের আছে। কিছু গাছ তো সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন পর্যন্ত করে। এককথায় প্রকৃতির রাজ্যে সৌরশক্তির এই রূপান্তর ঘটে চলেছে অতি সাবলীল ভাবে এবং ব্যাপক মাত্রায়। তাই গাছকে সৌরশক্তি ব্যবহারের সেরা মাধ্যম হিসেবে বিজ্ঞানীরা মেনে নিয়েছেন। অতএব চেষ্টা চলেছে গাছকে ও গাছ থেকে পাওয়া জৈব পদার্থগুলিকে (biomass) সার্থকভাবে কাজে লাগানোর। আমাদের গর্বের কথা এই যে, ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই কাজে যথেষ্ট এগিয়ে আছেন।

এই ব্যাপারে দুটি প্রধান পথের কথা বিজ্ঞানীরা ভেবেছেন। প্রথমটিতে বায়োমাসের প্রত্যক্ষ ব্যবহার (যেমন জ্বালানী কাঠ) অথবা পরোক্ষ ব্যবহার (যেমন গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট) করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে সালোকসংশ্লেষ অথবা কৃত্রিম সালোকসংশ্লেষ পদ্ধতির সাহায্যে জলকে বিশ্লিষ্ট করে উৎপন্ন হাইড্রোজেনকে জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করার কথা ভাবা হচ্ছে। দুটি

পদ্ধতিতেই বিশেষ সুবিধা হল, সংগৃহীত সৌরশক্তিকে জমিয়ে রাখা অনেক অল্পায়াসেই সম্ভব।

বায়োমাসের উৎপাদন ও ব্যবহার :

বায়োমাসের উৎপাদনের জন্য মুখ্যতঃ তিনটি রাস্তা খোলা আছে। (1) চাষ আবাদের মাধ্যমে ফসল উৎপন্ন করা। তার থেকে শাকশব্জি, শস্য বা খড়পাতা, কাঠকুটো যা পাওয়া যায় তাকে খাদ্য (প্রকারান্তরে শক্তি) এবং জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। (2) দ্রুত বাড়ে এমন বড় বড় গাছ (যেমন ইউক্যালিপ্টাস) লাগান—উৎপন্ন কাঠ জ্বালানী হিসেবে, কাগজ তৈরীতে, জ্বালানী গ্যাস প্রস্তুতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। (3) জলের মধ্যে শেওলাজাতীয় গুল্মের চাষ—এ থেকেও প্রচুর বায়োমাস পাওয়া যেতে পারে (আলোকচিত্র-৪)।

বিভিন্ন এসব পদ্ধতির ভেতর প্রথম পদ্ধতিটিই আমাদের সর্বাপেক্ষা পরিচিত ও স্বল্পব্যয়সাধ্য। দ্বিতীয় পদ্ধতিও আস্তে আস্তে চালু হচ্ছে। তবে এই কাজে কিছু অসুবিধাও দেখা দিচ্ছে। যেমন ইউক্যালিপ্টাসের নিবিড় চাষ সেই অঞ্চলের ভূগর্ভের জলস্তরকে নামিয়ে দেয়।

তৃতীয় পদ্ধতিটি খুবই নতুন হলেও পানিফলের চাষ অনেকাংশে এই পদ্ধতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। শেওলার চাষ বিশেষ উপযোগী হতে পারে ময়লা জল পুনর্ব্যবহার কেন্দ্রের সঙ্গে সংযুক্ত পদ্ধতি হিসেবে। জলের ময়লাকে শেওলারা সার হিসেবে খেয়ে সাফ করবে, নিজেরাও পুষ্ট হয়ে হু হু করে বেড়ে উঠবে দিনে দিনে। অতি লোনা জলে বাঁচতে পারে এমন শেওলারও সন্ধান পাওয়া গেছে। এরা বায়ুর নাইট্রোজেনকে প্রোটিনে রূপান্তরিত করে। জলে এইসব শেওলার চাষ ক'রে তাদের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা যাবে অথবা পচিয়ে জ্বালানী গ্যাস, অ্যালকোহল বানানো যাবে।

খাদ্য হিসেবে শৈবালজাতীয় এইসব গুল্ম খুবই মূল্যবান। যেমন দেখা গেছে, শুকনো ক্লোরেলা গুল্মের 50 শতাংশই প্রোটিন। এতটা প্রোটিন আর কোন শাকসব্জীতে পাওয়া যায় না। আর এসব গুল্মে যে সব প্রোটিন থাকে তারা মানুষের শরীরের পক্ষে বিশেষ উপযোগী এবং অত্যন্ত সহজপাচ্য। গুল্ম থেকে সুস্বাদু স্যুপ, জিলেটিন, চকোলেট মিল্ক, স্যালাড, আইসক্রীম তৈরী হয়। এদের প্রত্যেকটিই রুগ্ন বা শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। গুল্ম থেকে তৈরী প্ল্যাঙ্কটন

স্যাপ, কুষ্ঠ-রোগীদের খেতে দিয়ে আশ্চর্য ফল পাওয়া যায়। কুষ্ঠ রোগগ্রস্তদের এক কলোনীর অধিবাসীদের 1942-'46, এই চারবছর প্ল্যাঙ্কটন স্যাপ দেওয়া হয়। 8—80 সব বয়সের রোগীরা এখানে ছিলেন। চার বছরে তাদের প্রত্যেকের উল্লেখযোগ্য স্বাস্থ্যোন্নতি ঘটে। মুমূর্ষু রোগীরও ওজন বেড়ে যায়।

"শক্তি চাষের" এই তিনটি পদ্ধতিরই প্রধান সমস্যা হল জায়গা। বারওয়েলের হিসেব অনুসারে বাস্তব ক্ষেত্রে 10^{18} জুল শক্তি দিতে পারে এমন বায়োমাস উৎপন্ন করতে 120 লক্ষ হেক্টর (46,300 বর্গমাইল) জমি দরকার। আপাততঃ পতিত জমি আর অব্যবহৃত জলাজমি ব্যবহার করা গেলেও, শক্তির চাহিদা ও মূল্য বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্যের চাষ আর "শক্তির চাষের" মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা দেখা দেবে। এমনও হতে পারে যে খাদ্যশস্যের অভাব সত্ত্বেও শক্তিচাষেই চাষীরা বেশি উৎসাহিত হবেন অধিক মুনাফার লোভে।

শক্তির চাষে মূলতঃ যে দিকগুলির ওপর জোর দেওয়া হয়, তা হল—গাছ দ্রুত বাড়বে, সেচ, সার ন্যূনতম লাগবে, অল্প জমিতে বেশী ফলবে, পোকাকে প্রতিরোধ করতে পারবে এবং সর্বোপরি স্থানীয় জলহাওয়ার উপযোগী হবে।

এসব বিবেচনা করে আমাদের দেশের পক্ষে সূর্যমুখী (তেল), আখ (খাদ্য, অ্যালকোহল, জ্বালানী), আকাশমনি, সুবাবুল, ইউক্যালিপ্টাসের চাষ উপযোগী হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। জলজ উদ্ভিদ হিসেবে কচুরীপানা বায়োমাসের এক উৎকৃষ্ট উৎস হতে পারে। এ নিয়ে প্রচুর চেষ্টা আমাদের দেশে হচ্ছে। আমেরিকাতে শারগম (Sorghum), সুদান গ্রাস প্রভৃতির চাষের উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। শারগম এবং সুদান গ্রাস কেটে নিলে আবার হয়; গরম আর খরা দুইই খুব সইতে পারে, এবং মাত্র তিন মাসে প্রতি একরে 10—30 টন পর্যন্ত ফলান যায়। ইউফোরবিয়া নামক গাছ থেকে পেট্রোলের মত এক জাতীয় আঠা বেরোয়। এক সময়, শক্তি সংকট সমাধানে এর ভূমিকা খুব উজ্জ্বল হবে মনে করা হয়েছিল। কিন্তু সম্প্রতি দেখা গেছে যে, পূর্বে একে যতটা উচ্চফলনশীল বলে দেখান হয়েছিল, আদপেই তা নয় এবং এই গাছের চাষ করা আর্থিক দিক থেকে নিরর্থক বলে অভিমত দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

আখ ইত্যাদি মিষ্ট জাতীয় জিনিষ থেকে সহজেই অ্যালকোহল উৎপন্ন করা যায়। অ্যালকোহল একটি ভাল জ্বালানী। অধুনা পেট্রোলের (আমেরিকায়

বলে গ্যাস) সঙ্গে নির্দিষ্ট পরিমাণ অ্যালকোহল মিশিয়ে তৈরী হচ্ছে গ্যাসোহল। গ্যাসোহল দিয়ে মোটরগাড়ী চালান হচ্ছে। এর ফলে ক্রমশঃই দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য পেট্রোলের অভাব অনেকাংশে মেটান যাবে। এই ব্যাপারে ব্রাজিলের অগ্রগতি অত্যন্ত প্রশংসনীয় ব্রাজিলের চিনি কলগুলিতে লরি বোঝাই আখ আনার জন্যে লরিতে ডিজেলের বদলে ব্যবহার হচ্ছে ঐ আখের রস থেকেই পাওয়া অ্যালকোহল। ব্রাজিলের ক্রহিস্লার মোটর কোম্পানীর কয়েক শ' লরি-ট্রাক এখন অ্যালকোহল জ্বালানীর ব্যবহারে পটু হয়ে উঠেছে।

দরিদ্র দেশগুলিতে বেশির ভাগ মানুষই কয়লা, কেরোসিন জাতীয় বাণিজ্যিক জ্বালানী কিনতে পারেন না। এই সব মানুষেরা (অধিকাংশই গ্রামীণ) বায়োমাসকে সরাসরি জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করে যে শক্তি সংগ্রহ করেন শুধু 1980তে তার পরিমাণ ছিল প্রায় সাড়ে সাত কোটি টন কয়লার তুল্য। বাঁচার তাগিদে এ কাজ করতে গিয়ে তারা নির্বিচারে গাছ কাটছেন। তৃতীয় বিশ্বের সব দেশগুলিকে একত্রে ধরলে এসব দেশের এক থেকে দেড় কোটি হেক্টর জমি থেকে প্রতি বছর সবুজের চিহ্ন মুছে যাচ্ছে—দ্রুত এগিয়ে আসছে অনাবৃষ্টি আর মরুগ্রাসের থাবা। এসব কারণেই বায়োমাসের উৎপাদন শুধু দ্রুত বৃদ্ধিই নয়, তার উপযুক্ত ব্যবহারও চালু করা এই সব দেশে অত্যন্ত প্রয়োজন। তাছাড়া এভাবে বায়োমাস সরাসরি পোড়ালে তার অন্তর্নিহিত শক্তি অতি অল্পই কাজে আসে। এই কারণে দেখা গেছে যে, একজন গ্রামীণ মানুষ তার খাদ্য হিসেবে যেখানে প্রতিদিন বড়জোর 2500 ক্যালরী শক্তি গ্রহণ করেন, সেখানে ওই খাবার রান্না করতে তার প্রতিদিন ব্যয় হয় 8900 ক্যালরী শক্তির সমতুল্য জ্বালানী। এভাবে সরাসরি পুড়িয়ে না দিয়ে বায়োমাসের অন্তর্ধূম পাতন করলে সবটুকু কার্বন কাঠকয়লায় রূপান্তরিত তো হয়ই, উপরন্তু পাওয়া যায় মূল্যবান নানান রাসায়নিক পদার্থ। অথবা অবাতসন্ধান প্রক্রিয়ায় গোবর গ্যাস প্ল্যান্টে বায়োমাসকে পচালে মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড প্রভৃতি মিশ্র জ্বালানী গ্যাস তো পাওয়া যায়ই, অধিকন্তু মেলে দামী জৈব সার। ভারতে গোবর গ্যাস প্রকল্পকে তাই সরকার নানান ভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন। গোবর গ্যাসের প্ল্যান্টের সংখ্যা ভারতে এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই '74—'79 এই পাঁচ বছরে 75,000টি করা হয়। ষষ্ঠ পরিকল্পনার মধ্যে লক্ষ্যমাত্রা ধার্য আছে 5 লক্ষ।

জল থেকে হাইড্রোজেন—জলের সালোকবিশ্লেষণ :

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে সালোকসংশ্লেষের বর্তমান রূপের প্রথম স্তর হল ক্লোরোফিল অনুঘটকের উপস্থিতিতে জলের সালোকবিশ্লেষণ অর্থাৎ সৌরালোকের শক্তিতে হাইড্রোজেন আর অক্সিজেনে বিভাজন। জল এমনিতে খুব সুস্থিত যৌগ; তাকে ভাঙতে গেলে প্রচুর শক্তির প্রয়োজন। গাছেদের দেহকোষে ক্লোরোফিলের উপস্থিতিতে কিন্তু খুব সহজেই এই বিক্রিয়া ঘটে থাকে। উৎপন্ন হাইড্রোজেন/ইলেকট্রন এখন CO_2-কে বিজারিত করে শর্করা, নাইট্রোজেনকে বিজারিত করে অ্যামোনিয়া উৎপাদন করতে পারে। যদি বিজারিত হবার মত কেউ না থাকে তবে হাইড্রোজেন বা ইলেকট্রন সরাসরি মুক্ত হয়। H_2 গ্যাস পাওয়া যায়; পরিবাহীর উপস্থিতিতে তড়িৎপ্রবাহও পাওয়া সম্ভব। কৃত্রিম ক্লোরোফিলজাতীয় যৌগ ব্যবহার করে বিভিন্ন কৃত্রিম সালোকসংশ্লেষী তন্ত্র বিজ্ঞানীরা এই নীতির ভিত্তিতে তৈরী করেছেন। এদের দ্বারা সৌরশক্তি থেকে হাইড্রোজেন বা তড়িৎ সরাসরি পাওয়া যেতে পারে।

ক্লোরোফিল বা তদনুরূপ বস্তুর বদলে ভিন্ন জাতীয় বেশ কিছু অনুঘটকও ইদানীং জলের সালোকবিশ্লেষণে সার্থকতার সঙ্গে ব্যবহৃত হচ্ছে। এদের মধ্যে মিথাইল ভায়ালোজেন নামে একটি যৌগ এবং বিভিন্ন রুথেনিয়াম (লৌহের সমগোত্রীয় মৌল)-ঘটিত যৌগের ব্যবহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এদের সাহায্যে আলোকরশ্মির প্রভাবে হাইড্রোজেন এবং তড়িৎপ্রবাহ জল থেকে পাওয়া যায়।

গাছেদের শরীরে সালোকসংশ্লেষের গোটা প্রক্রিয়াটির কার্যকারিতা সাধারণ ক্ষেত্রে 0·1% এর বেশী হয় না। কিছু কিছু শস্যের ক্ষেত্রে অবশ্য 1·6% পর্যন্ত কার্যকারিতা পাওয়া গেছে। সালোকসংশ্লেষের প্রথম স্তর অর্থাৎ সালোক-বিশ্লেষণের কার্যকারিতা আলাদাভাবে কিন্তু অনেক বেশি। তাই উপরের বর্ণিত সালোকবিশ্লেষণের পদ্ধতিগুলিও বিশেষ কার্যকরী হতে পারে।

জৈব সালোকবিশ্লেষণ :

সালোকসংশ্লেষের ফলে গাছেরা অক্সিজেন ছাড়ে। কিন্তু এমন কিছু সালোকসংশ্লেষী অনুজীব (micro organism) আছে (যেমন পূর্বে আলোচিত ক্লস্ট্রিডিয়াম), যারা সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়াকালে হাইড্রোজেন গ্রহণ বা উদ্গিরণ করতে পারে। হাইড্রোজেন উদ্গারী সালোকসংশ্লেষী ব্যাকটেরিয়াদের প্রথম

লক্ষ্য করেন জাপানী বিজ্ঞানী নাকামুরা (Nakamura, 1937)। পরবর্তীকালে গ্যাফ্রণ (Gafron, 1940) লক্ষ্য করেন যে সবুজ গুল্ম সেনেডেমাস (Scenedesmus)-কে অক্সিজেনের অনুপস্থিতিতে কয়েক ঘণ্টা অন্ধকারে রেখে হাইড্রোজেন পাঠালে, ওই গুল্মদের দেহকোষে অভিযোজনমূলক বিবর্তন ঘটে। এই বিবর্তিত গুল্মরা তখন গ্লুকোজ ভক্ষণ করে হাইড্রোজেন উদ্গিরণ করে। একই জাতীয় ঘটনা অন্যান্য সবুজ, লাল এবং বাদামী শেওলাদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করেন ফেঙ্কেল ও রিগার (Fenkal and Rieger, 1951)।

ইদানীংকালে (1977) কেসলার (Kessler) ও বিশপ (Bishop), ক্লোরোফাইসিয়া (Chlorophycaea) গোষ্ঠীর অজস্র গুল্মদের মধ্যে এ জাতীয় ক্রিয়ার সন্ধান পেয়েছেন। তবে এ ব্যাপারে সবচেয়ে উপযোগী প্রমাণিত হয়েছে সায়ানোব্যাকটেরিয়া (cyanobacteria) জাতের অনুজীবেরা এরা বায়ুর নাইট্রোজেন খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে, আলাদাভাবে খাবার দিতে হয় না ; পরিবর্তে জল থেকে দীর্ঘদিন (এক মাস) হাইড্রোজেন উদ্গিরণ করে। অক্সিজেনযুক্ত পরিবেশেও এরা ক্রিয়া করে। ফলে প্রায় নিখরচায় জল থেকে হাইড্রোজেন পাওয়া সম্ভব।

সৌরশক্তির সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও ব্যবহারে এই ধরণের প্রক্রিয়া—যাকে বিজ্ঞানীরা জৈব সালোকবিশ্লেষণ নাম দিয়েছেন—তার বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকবে বলে মনে হয়।

সৌরশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ

"Nothing succeeds like success"—*Dumus*

অতীত কথা :

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর প্রয়াস বহু শতাব্দী আগেই শুরু হয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব 212 অব্দে গ্রীক দার্শনিক আর্কিমিডিস (Archimedes) শুধুমাত্র সূর্যের আলোকে কাজে লাগিয়ে আক্রমণকারী মার্সেলাসের (Marcellus) রোমান নৌবাহিনীকে পুরোপুরি ভস্ম করে দিয়েছিলেন। "*De Temperamentis*"-এ গ্যালেনের (Galen) বিবরণ থেকে জানা যায় যে "জ্বলন্ত দর্পণ' ব্যবহার করে নাকি এই অসাধ্য সাধন করা সম্ভব হয়েছে। তবে লিভি (Livy), প্লুটার্ক (Plutarch) এদের কাছে ঘটনার বিশদ বর্ণনা না পাওয়া গেলেও মার্সেলাসের বিপক্ষে আর্কিমিডিসের তৈরী উন্নতমানের অস্ত্র ব্যবহারের কথা শোনা গেছে। দ্বাদশ শতাব্দীর লেখক জোনারাস্ (Ioanne Zonaras) তার "*Chronicon*" গ্রন্থে কনস্টান্টিনোপ্‌ল্ বিজয়ের বর্ণনা দিতে গিয়েও বলেছেন যে প্রোক্লাস (Proclus) নাকি আর্কিমিডিসের মতোই "জ্বলন্ত দর্পন'' ব্যবহার করে ভিটেলিয়াসের (Vitellius) নৌবহরকে জ্বালিয়ে দেন। আর্কিমিডিসের এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে বহু বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। অনেকে একে উড়িয়ে দিয়েছেন। আবার অনেকে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তাধারা নিয়ে এর সম্ভাব্য দিকটি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করেছেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর স্থপতি অ্যান্থামিয়াস (Anthermius) "*Mechanical Paradoxes*'' নামক গ্রন্থে হিসেব-নিকেশ করে দেখিয়েছেন যে নির্দিষ্ট আকৃতির চব্বিশটি দর্পণ বিশেষভাবে সাজিয়ে সত্যিই এমনতর যাদু করা সম্ভব।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে গ্যালিলিওর দুরবীক্ষণ যন্ত্রের আবিষ্কার এবং সূর্য ও সৌরজগৎ সম্বন্ধে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও তত্ত্বগুলো সৌর গবেষণার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব আনে। ফ্রান্সে সোলোমন দ্য কক্স (Solomon de Caux) উত্তপ্ত বায়ু-চালিত সৌর ইঞ্জিন গড়ে তোলেন। বায়ু উত্তপ্ত করার কাজে তিনি দর্পণ ও লেন্স ব্যবহার করতেন। দ্য কক্সের এই চমকপ্রদ আবিষ্কার সৌরশক্তি ব্যবহারের

ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এর পর কার্সার (Kircher) আর বুফো (Buffon) আর্কিমিডিসের অনুকরণে সূর্যরশ্মির প্রতিফলন ঘটিয়ে দূরের বস্তুতে আগুন জ্বালাতে সমর্থ হন। এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে ফ্রান্সের ভিলেত্তি চকচকে লোহা দিয়ে গড়া সোলার ফার্নেস বানান, যা দিয়ে লোহা, তামা ইত্যাদি ধাতুকে সহজেই গলানো সম্ভব। এই ফার্নেস ফ্রান্সের বাইরে পারস্য ও ডেনমার্কেও চালু করা হয়েছিল। এদিকে সপ্তদশ শতাব্দীতে লেন্স তৈরীর ব্যাপারে কাজ অনেকটা এগিয়ে যায় 1695 খ্রীষ্টাব্দে ইটালিয়ান দুই বিজ্ঞানী তার্গিয়নি (Targioni) ও অ্যাভেরনি (Averoni) "জ্বলন্ত কাঁচ" দিয়ে নাকি এক টুকরো হীরে পর্যন্ত জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। ঐ সময়ে "জ্বলন্ত কাঁচ" নিয়ে আর যারা কাজ করেছেন তাদের মধ্যে ইংলাণ্ডের পার্কার (Parker) ও জার্মানির ৎসিয়ার্ন হাউজের (Tschirn Hauss) নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসী বিজ্ঞানী ল্যাভোয়েসিয়ার (Lavoisier) শক্তিশালী লেন্স দিয়ে সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে পদার্থের দহন ঘটিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল "ফ্লজিস্টন" মতবাদকে (Phlogiston Theory) নস্যাৎ করা। এই মতবাদ অনুযায়ী তাপের বস্তুধর্ম রয়েছে। অথচ এই পরীক্ষার সাহায্যে ল্যাভোয়েসিয়ার দেখান যে ঐ দহনের ফলে বস্তুর ওজনের বিশেষ পরিবর্তন ঘটে না। অর্থাৎ "ফ্লজিস্টন মৌলটির" সদ্ অস্তিত্ব নেই। একটি 52 ইঞ্চি ব্যাসের লেন্সের সাহায্যে ল্যাভোয়েসিয়ার তাপমাত্রা পেয়েছিলেন প্রায় 1750 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, যা প্লাটিনামকেও গলিয়ে দিতে পারে। এটাই ছিল সেই সময়ের সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রার রেকর্ড। সোলার ফার্নেসের ধারণাকে বাস্তবায়িত করার কাজ ল্যাভোয়েসিয়ার আরও কিছুটা এগিয়ে রাখেন। তাঁর গবেষণার কাজে সোলার ফার্নেস গুরুত্ব পাওয়ার প্রধান কারণ হল এই পদ্ধতিতে উত্তপ্ত করার সময়ে পদার্থের দূষিত হওয়ার কোন সম্ভাবনা থাকে না (আলোকচিত্র-9)। ল্যাভোয়েসিয়ারের অকালমৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই সংক্রান্ত গবেষণাও বন্ধ হয়ে যায়। এ বিষয়ে নতুন চিন্তা-ভাবনা শুরু হতে পেরিয়ে যায় একশ' বছরেরও বেশি সময়।

এদিকে তাপ কক্ষের আবিষ্কারের পরও বহু বছর কেটে যায় একটি উন্নত ধরনের সৌর ইঞ্জিন গড়ে তুলতে। সাফল্যের দরজায় পৌছান স্যার জর্জ কেলি (Sir George Cayley, 1807) এবং স্কটল্যাণ্ডের পাদরী রবার্ট স্টার্লিং (Robert Stirling) আর তাঁর ভাই জেম্স্ (1816)। উত্তপ্ত বায়ু চালিত স্টার্লিং ইঞ্জিন ঐ

সময়ে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। এছাড়া 1826 সালে জন্ এরিক্‌সনের (John Ericsson) তৈরী গরম বায়ু-চালিত ইঞ্জিনটিকেও সৌরশক্তির সাহায্যে চালানো সম্ভব হল। এর পর আসা যাক উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। তখন সৌর ইঞ্জিনের ওপর গবেষণার বেশ ধুম পড়েছে। ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের পৃষ্ঠপোষকতায় অগাস্ট মৌসো (August Mouchot) গড়ে তুললেন সৌরশক্তি চালিত স্টীম ইঞ্জিন (1866—'72)। আল্‌জিরিয়ায় জল তোলার কাজে ব্যবহার করে এর কার্যকারিতাও খতিয়ে দেখা হয়। প্রায় ছয় বছর পর এই মৌসোই এর উন্নত ও অপেক্ষাকৃত বড় সংস্করণটি নির্মাণ করেন। ইতিমধ্যে সুইডেনের জন এরিক্সন্ (John Ericsson) এই সংক্রান্ত গবেষণায় তাঁর উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে পান সাম্মানিক ডক্টরেট ডিগ্রি। 1883 সাল নাগাদ তিনি সৌর ইঞ্জিনের ন'টি মডেল তৈরী করেন। সর্বশেষটি দ্বিতীয় বৃহত্তম সৌর ইঞ্জিন বলে পরিচিত। অর্থনৈতিক কারণ এর জনপ্রিয়তায় বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে দেখে এরিক্সন তাঁর ইঞ্জিনকে কয়লা ও গ্যাস চালিত করে তোলেন। এর পর পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি এরিক্সন ইঞ্জিন বিক্রী হয়। তাঁর তৈরী বিভিন্ন ধরনের সৌর ইঞ্জিন ফিলাডেলফিয়ার "আমেরিকান সুইডিস হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি"তে ঐতিহাসিক নিদর্শন হয়ে রয়েছে। 1876 সালে বম্বেতে আডাম্‌সের (Adams) তৈরী প্রায় দুই কিলোওয়াট ক্ষমতার সৌর ইঞ্জিন এবং ফ্রান্সের চার্লস এলবার্ট টেলিয়ারের (Charles Albert Tellier) তৈরী বিশালাকৃতির সমতল গ্রাহকযুক্ত সৌর ইঞ্জিনের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কাছাকাছি সময়ে ফ্রান্সের আবেল্ পিফ্রের (Abel Pifre) তৈরী একটি সৌর স্টীম ইঞ্জিনও ব্যবহৃত হয়েছে বলে জানা যায় *"La Journal Soleil"* নামক পত্রিকা থেকে। এই সত্তরের দশকেই ইতালির আন্তোনিও পসিনোত্তি (Antonio Pacinotti) সৌরশক্তিকে বিভিন্নভাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সৌরশক্তি চালিত গ্যাস ইঞ্জিন তৈরী, সাহারা মরুভূমিতে ব্যবহারযোগ্য সোলার কালেক্টার নির্মাণ, সমুদ্র জলের বিভিন্ন গভীরতায় তাপমাত্রার প্রভেদ থেকে শক্তি উৎপাদন ইত্যাদি।

সৌরশক্তি চালিত ইঞ্জিনগুলির মধ্যে পুরোনো দিনে সবচেয়ে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল রবার্ট স্টার্লিং আবিষ্কৃত উত্তপ্ত বায়ুচালিত ইঞ্জিন। কার্নোর তত্ত্বের প্রস্তাবনার আট বছর আগে অর্থাৎ 1816 খ্রীষ্টাব্দে উদ্ভাবিত এই ইঞ্জিনের দক্ষতা

ছিল খুবই সন্তোষজনক, এমন কি অন্যান্য তাপ ইঞ্জিনের চেয়ে অনেকাংশে বেশি। তবুও নানান ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য উত্তপ্ত বায়ুচালিত এই ইঞ্জিন আজ অপ্রচলিত হয়েছে। পরবর্তীকালে স্টার্লিং ইঞ্জিনের অনেক সংস্করণ করা হয়; এমনকি 1958 সালে নেদারল্যাণ্ডের এন. ভি. ফিলিপস ল্যাবোরেটরি (N. V. Phillips Laboratory) বিভিন্ন ধরনের স্টার্লিং ইঞ্জিন বার করে এবং আমেরিকার মহাকাশ কেন্দ্র নাসার (NASA) জন্যে সৌরশক্তি চালিত ও মহাকাশে ব্যবহারোপযোগী একটি তিনশ' কিলোওয়াট শক্তিসম্পন্ন ইঞ্জিন তৈরীর জন্যে চুক্তিবদ্ধ হয়। এদিকে 1960 সালে আমেরিকার ড্যানিয়েলস্ (Daniels) আর ফিঙ্কেলস্টাইন্‌ও (Finkelstein) মহাকাশে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে স্টার্লিং ইঞ্জিনের যে সংস্করণটি করেন তাতে সূর্যের আলোকে অনায়াসে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। অনেকের মতে এর ভবিষ্যত খুবই সম্ভাবনাময়।

রান্নাবান্নার কাজে সৌরশক্তির ব্যবহারের চেষ্টাও নতুন নয়। আজ থেকে দেড়শ বছরেরও আগে সোলার কুকার বানানো হয়েছে। বম্বের আডামস্, ইংল্যাণ্ডের হেয়ার্শেল (Herschel), সুইজারল্যাণ্ডের দ্য সোস্যুরে (de Saussure), ফ্রান্সের মোসো প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই গবেষণায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। 1878 সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে মোসো তাঁর মডেলের কার্যকারিতা দেখানোর জন্যে মাত্র কুড়ি মিনিট সময়ে এক পাউণ্ড পরিমাণ মাংস তার সোলার কুকারে রান্না করে ফেলেন। এরপর স্যামুয়েল পিয়েরপন্ট ল্যাংলী (Samuel Pierpont Langley) ও আরও পরে চার্লস গ্রীলি অ্যাবট (Charles Greely Abbot) উন্নত ধরনের ওভেন তৈরী করেন।

আমরা দেখেছি যে চড়া রোদে জিনিষপত্র শুকোনোই হল সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রাচীনতম পদ্ধতি। এভাবে তৈরী করা হয় সমুদ্রের লোনা জল থেকে নুন, শুকোনো হয় শস্য আর জ্বালানী। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় চিলির লা সালিনাসে (Las Salinas) চার্লস উইল্‌সনের তৈরী বিশাল সৌর পাতন যন্ত্রটির কথা, যা চল্লিশ বছর ধরে ঐ খনি অঞ্চলের লোকদের পানীয় জল জুগিয়ে এসেছে। অনুরূপ প্রচেষ্টা এর পর অন্যত্রও হয়েছে। তবে লা সালিনাসের মতো মুষ্টিমেয় সফল প্রচেষ্টা ছাড়া উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রয়াস বানচাল হয়ে গিয়েছে অর্থনৈতিক প্রতিকূলতার জন্যে।

বিংশ শতাব্দীর কর্মকাণ্ড ঃ

উনবিংশ শতকের ব্যর্থতা বিজ্ঞানীদের মনে কিন্তু হতাশা জাগাতে পারে নি। বরং দেখা গেল ঐ শতাব্দীর শেষদিকে তাঁরা নতুন উৎসাহ আর উদ্দীপনা নিয়ে ফের কোমর বাঁধলেন। শুরু হল এক বিরাট কর্মযজ্ঞ। বর্তমান শতাব্দীতে এ'তে দেওয়া হল ঘৃতাহুতি।

সুফল ফলতে দেখা গেল বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেই। শুধুমাত্র আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রেই গড়ে উঠল বেশ কিছু সংখ্যক বিশালাকৃতির সৌর ইঞ্জিন। এমনই একটি বসানো হয়েছিল কালিফোর্নিয়ার পাসাডোনাতে এক খামারে। এনিয়াস (A. G. Eneas)-এর তৈরী এই ইঞ্জিনটি পরে আরিজোনার মরুভূমিতেও চালানো হয়। আরিজোনা রিপাব্লিকান্ নামে এক সংবাদপত্রে এই সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ পাওয়া যায়। এর প্রতিফলকটি 1788টি দর্পণ দিয়ে গড়া এক বিরাট উল্টোনো ছাতার মতো দেখতে। কাল্পনিক ঐ ছাতার হাতলের বাঁকানো অগ্রভাগের কাছাকাছি থাকে প্রতিফলক তলের ফোকাস বিন্দুটি। সেখানে, অবতল দপর্ণে প্রতিফলনের নিয়ম অনুসারে প্রতিফলিত সূর্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত হয়। ফলে ফোকাসে রাখা বয়লারের জল থেকে সহজেই স্টীম পাওয়া যায়। বাকি কাজটুকু হল স্টীম ইঞ্জিনের। এই ইঞ্জিনের ক্ষমতা ছিল প্রায় আট কিলো ওয়াট। ভর দুপুরে এই ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াতো 12—15 কিলো ওয়াট পরিমাণ। এছাড়া প্রতিফলকে দর্পণের সংখ্যা বাড়িয়েও এই ক্ষমতা আরও বেশ কিছুটা বাড়ানো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু বিজ্ঞানী ও উদ্যোক্তাদের উচ্চাশা শীঘ্রই ভেঙে গেল। প্রাকৃতিক দুর্যোগে সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হল এর একটি ইউনিট।

ফ্রান্সের টেলিয়ার (Tellier) সৌর ইঞ্জিনে সমতল গ্রাহকের যে ব্যবহার চালু করেন তা অনুসরণ করে আমেরিকায় 1902 সালে উইল্সী (H. E. Willsie) ও বয়েল (John Boyle, Jr.) গড়ে তোলেন তাঁদের সৌর ইঞ্জিন। আরও বছর তিনেক বাদে এঁরা কালিফোর্নিয়ার নীড্ল্সে ছ'শ বর্গফুট জায়গা জুড়ে এক সমতল গ্রাহক গড়ে তোলেন। এর সাহায্যে একটি স্লাইড ভালব্ ইঞ্জিনকে কাজে লাগিয়ে চালানো হয়েছে একটি জল তোলার পাম্প, একটি কম্প্রেসার পাম্প ও দুটি সার্কুলেটিং পাম্প। এরপর 1908 সালে এঁরা আরও দুটি অপেক্ষাকৃত বড় সমতল গ্রাহক তৈরী করেন। এক হাজার বর্গফুটের এই গ্রাহকে তাপ সঞ্চয়েরও ব্যবস্থা ছিল। এর সাহায্যে চালানো হল প্রায় দশ

কিলো ওয়াট ক্ষমতার একটি সালফার ডাই-অক্সাইড ইঞ্জিন। সমতল দর্পণ ব্যবহার করায় নির্মাণ ব্যয় অনেক কমে গেল। তা সত্ত্বেও প্রতি কিলো ওয়াট পরিমাণে যে খরচ পড়ল তা কয়লা ব্যবহারে যে খরচ দাঁড়ায় তার চার গুণ বেশি।

অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সৌরশক্তিকে এক সম্মানজনক স্থানে পৌঁছে দেওয়ার বাস্তব চিন্তাধারা এবং পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে এলেন ফ্রাঙ্ক স্যুমান **(Frank Shuman)**। 1907 সালের পেনিসিলভানিয়ার টাকোনিতে **(Tacony)** তার প্রথম চেষ্টা সফল হল। খরচ কমানোর জন্যে সমতল গ্রাহক ব্যবহার করে এই পরীক্ষামূলক ইঞ্জিনটি থেকে পেলেন আড়াই কিলো ওয়াট সমান ক্ষমতা। সাফল্যের আনন্দ তাঁর উৎসাহ ও সাহস দুইই বাড়িয়ে দিল। এর পর এক অত্যাশ্চর্য পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন—আর ইঞ্জিন না; গড়তে হবে চার একর জমি জুড়ে বিশালাকৃতির এক সোলার স্টীম প্ল্যাণ্ট। এবার জমিকেই কাজে লাগাতে হবে গ্রাহক হিসেবে। জমিতে আল্ দিয়ে অগভীর ও চওড়া ট্রের মতো আধার গড়ে তুলতে হবে। মাটির ওপর পীচ ইত্যাদির সাহায্যে জল নিরোধী আস্তরণ গড়ে তোলার পর ট্রেগুলো জলপূর্ণ করা হবে। তাপ আটকে রাখার জন্যে জলের ওপরে প্যারাফিনের একটা পাত্‌লা আস্তরণ থাকবে আর সবার বাইরে থাকবে কাঁচের ঢাকনি। বিশালাকৃতির এই অভিনব গ্রাহক ও তাপাধারটি থেকে পাওয়া তাপ থেকে সহজেই চালানো যেতে পারে টার্বাইন। হিসেব মতো যার উৎপাদন দাঁড়াবে প্রায় সাড়ে সাত মেগাওয়াট। শুধু তাই নয়, হিসেব কষে দেখা গেল যে এক্ষেত্রে উৎপাদন ব্যয় কয়লা খরচের প্রায় সমান। প্রস্তাবটি বাস্তবায়িত করা সম্ভব না হলেও এ থেকে স্যুমানের উন্নত চিন্তাধারা ও সাহসিকতার পরিচয় মেলে। এর পর স্যুমান একটি 80 কিলোওয়াট ক্ষমতার ইঞ্জিন গড়ে তোলেন ও তাকে ব্যবহার করেন। 1908 সালে তিনি "সান্ পাওয়ার" কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেন। ব্রিটিশ সহযোগিতায় পরে এটি হয়ে ওঠে "ইস্টার্ণ সান্ পাওয়ার কোম্পানী লিমিটেড্"। কায়রো শহরের অদূরে মিয়াদিতে এরা একটি 80 কিলোওয়াট ক্ষমতার পাওয়ার প্ল্যাণ্ট গড়ে তোলেন। 1912 সালে একে চালু করা হয়। এখানে সাতটি মাত্র অবতল দর্পনের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। পাঁচ ঘণ্টা পরীক্ষামূলকভাবে চালিয়ে এ থেকে শুধুমাত্র সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে কম করেও 40 কিলো ওয়াট পাওয়ার পাওয়া গেল। এক সময়ে তো এর পরিমাণ

বেড়ে দাঁড়ালো 50 কিলো ওয়াট। এর উৎপাদন ব্যয়ও আশাব্যাঞ্জক। এটিকে ব্যবহার করা হল নীলনদ থেকে জল সেচের কাজে। শোনা যায় যে এই কাজে এর আগে নাকি লাগত এক লক্ষ শ্রমিক। এতগুলি লোক বেকার হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায়, যন্ত্রশক্তির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা আরও ব্যাপক হল। সেই সঙ্গে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দমকা হাওয়া পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলল। ফলে সুমানের এই "মার্ভেলাস সোলার পাওয়ার প্ল্যাণ্ট" হল পরিত্যক্ত। সৌরশক্তি বিষয় গবেষণায় এ এক বিরাট আঘাত, যা সামলে উঠতে লেগেছিল প্রচুর সময়।

তবে এর পরবর্তী নিরাশার দিনগুলি একেবারে ঘটনাবিহীনভাবে কাটেনি। মাঝে মাঝে পাওয়া গেছে কিছু বিক্ষিপ্ত সংবাদ। এমনই এক খবরের সূত্র থেকে জানা যায় যে হ্যারিংটন নামে নিউ মেক্সিকোর এক ইঞ্জিনীয়ার সৌরশক্তি থেকে বিদ্যুৎ তৈরী করেছেন, যার সাহায্যে একটি খনির বৈদ্যুতিক আলোর চাহিদাও নাকি মেটানো সম্ভব হয়েছে। দিনের বেলায় সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে ফেলা হ'ত একটি বয়লারে। উৎপন্ন স্টীমের সাহায্যে একটি পাম্প চালিয়ে জল তোলা হ'ত একটি উঁচুতে রাখা আধারে। এবার এই জল সবেগে ওপর থেকে ফেলে তার তোড়ে চালানো হ'ত একটি ডায়নামো—যেমনটি করা হয়ে থাকে জলবিদ্যুতের ক্ষেত্রে। শোনা যায় যে এইভাবে দিনরাত সারাক্ষণ বিদ্যুৎ উৎপাদন করা সম্ভব হয়েছিল।

সৌরশক্তির ব্যবহারিক দিক নিয়ে নানান ধরনের গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্যে ঐ সময় ডঃ অ্যাবট যথেষ্ট খ্যাতিলাভ করেছিলেন। ইনি তৈরী করেন এক বিশেষ ধরনের কুকার। এতে প্রয়োজন হলে প্রতিফলকের সাহায্যে বেশ খানিকটা দূরে গিয়েও রাঁধা যেত। ফলে সুবিধা হল এই যে শুধুমাত্র খোলা আকাশের নীচেই নয়, ঘরের মধ্যে বসেও সোলার কুকার ব্যবহার করা সম্ভব হল। তাঁর তৈরী বিভিন্ন ধরনের বয়লার ও কুকারের মডেল আজও দেখা যায় Smithsonian Institute-এ। এ ছাড়া 1936 সালে তাঁর তৈরী 1 কিলোওয়াট ক্ষমতার ইঞ্জিনটি ওয়াশিংটনে ইণ্টারন্যাশানাল্ পাওয়ার কন্ফারেন্সে প্রদর্শিত হয়েছে।

আধুনিক রকেট বিদ্যার জনক বলে স্বীকৃত গডার্ড (R. H. Goddard) 1919 সালে বললেন যে, একটি রকেটকে চাঁদে পাঠাবার কাজে রাসায়নিক

শক্তি ছাড়াও সৌরশক্তিকে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে মহাকাশযানে সৌরশক্তির ব্যবহার যে খুবই সম্ভাবনাময়—এই আভাস তিনি দিয়েছিলেন আরও আট বছর আগে। পরবর্তীকালে (1929) সোলার পাওয়ার প্ল্যাণ্টের একটি নক্সাও তিনি তৈরী করেন। এতে তাঁর আধুনিক চিন্তাধারার বহু ছাপ পাওয়া যায়। আনন্দের কথা এই যে, রকেটের স্রষ্টা ছিলেন সৌরশক্তি ব্যবহারের এক উৎসাহী সমর্থক। তবে দুঃখের বিষয়, 1958 সালের যে শুভ মুহূর্তে ভ্যানগার্ড—1 সৌরশক্তিতে শক্তিমান হয়ে মহাকাশে রওনা হল, সেদিন বিজ্ঞানের এই দুই ভিন্নমুখী শাখার মিলন দেখা তাঁর ভাগ্যে ঘটল না।

1925 থেকে 1935 সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের জর্জেস্ ক্লডে (Georges Claude) বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে সমুদ্র জলের উষ্ণতার পার্থক্যকে কাজে লাগাতে সচেষ্ট হলেন। এর ফলে 'ওটেক' (Ocean Thermal Energy Conversion) সংক্রান্ত গবেষণাও কিছুটা এগিয়ে গেল। তাঁর গবেষণার ধারা অব্যাহত রাখার দায়িত্ব নেন স্বয়ং ফরাসী সরকার। গড়ে ওঠে এনার্জি ডেস্ মেয়ার্স (Energie des Mers)। এই প্রতিষ্ঠানের ওপর পরবর্তীকালে এই গুরুভারটি অর্পিত হয়।

এদিকে তিরিশের দশকেই রাশিয়ার আব্রাম ইয়ফে (Abram Ioffe) তাপ-বিদ্যুৎ সংক্রান্ত গবেষণায় খ্যাতিলাভ করেন। সোলার কালেক্টার ব্যবহার করে তিনি সৌর তাপ থেকে জেনারেটারের মাধ্যমে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়ে আমরা দেখেছি যে, সৌরকোষ নিয়ে গবেষণার সূত্রপাত বহুদিন আগে হলেও এক্ষেত্রে স্বর্ণযুগের আবির্ভাব ঘটেছে এই বিংশ শতাব্দীরই মাঝামাঝি সময়ে। 1839 সালে বিকুইরেল যে ইতিহাসের সূচনা করেন আডাম্স্, ডে প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা পরবর্তীকালে তাতে একের পর এক অধ্যায় সংযোজিত করে গেছেন। ব্রুনো লাংগে (Bruno Lange) কপার অক্সাইড, সিলভার সেলেনাইড ও একটি অজানা তৃতীয় বস্তুর সাহায্যে "ফটো-ভোল্টেইক" কোষ তৈরী করেন। 1931 সালে এর সাহায্যে সূর্যের আলো থেকে বিদ্যুৎ সৃষ্টি করা হয় কাইজার ভিল্‌হেল্ম্ ইনস্টিট্যুটে। তা দিয়ে চালানো হয়েছিল একটি মোটর। 1935 সালেও অনুরূপ একটি ফটোভোল্টেইক কোষ গড়ে তোলেন কলিন ফিংক (Colin Fink) কপার ও কপার-অক্সাইড থেকে। এর পরে এল সিলিকন সৌরকোষের যুগ। 1954 সালে বেল্ টেলিফোন

ল্যাবোরেটোরিতে এর আবিষ্কার সত্যিই এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই একটিমাত্র ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেন সৌরশক্তি গবেষণার ইতিহাসে ঘটে গেল নবজাগরণ। শুরু হল এক নতুন যুগের।

আধুনিক যুগ :

নতুন যুগের হাওয়ায় পাল তুলে পৃথিবীর নানান দেশে এগিয়ে চলল গবেষণা। এই সব দেশের বৈজ্ঞানিকরা সরাসরি আলোচনা ও পরস্পর মতামত বিনিময় করতে থাকলেন মিলিতভাবে সম্মেলন ডেকে। সবাই মিলে মিশে যেন গড়ে উঠল একটি আন্তর্জাতিক পরিবার। গবেষণালব্ধ ফলাফল প্রকাশের জন্যে শক্তি গবেষণার উপর জন্ম নিল বেশ কিছু গবেষণামূলক পত্রিকা। শুধুমাত্র সৌরশক্তি গবেষণার উপরেই প্রবন্ধ ছাপে এমন পত্রিকাও বের হয়েছে, যার অন্যতম একটি হল "সোলার এনার্জি"। অথচ মাত্র দু' দশক আগেও এদের অনেকের জন্মই হয় নি। এই বৈজ্ঞানিক উৎসাহের ঢেউ এসে পড়েছে দৈনিক পত্র-পত্রিকাগুলিতেও। খবরের কাগজে ইদানীং প্রায়ই ছাপা হচ্ছে সৌরশক্তির সার্থক ব্যবহারিক প্রয়োগের নতুন নতুন চমকপ্রদ খবর। গত এক দশকের মধ্যে এই সব বিজ্ঞান পত্রিকা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন খবরের কিছু বাছাই করা সংকলন এবার তুলে ধরা হল। আজকের এই কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নবজাগরণের অন্ততঃ একটা রূপরেখা পাওয়া যেতে পারে।

অতি সম্প্রতি অর্থাৎ 1984 সালেই কেরালার পালঘাট জেলায় স্থাপিত হয়েছে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় সোলার ড্রায়ার। 700 টনের এই ড্রায়ার তৈরী করতে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী শাখার (ডি এস টি) ব্যয় হয়েছে 14 লক্ষ টাকা। এর সাহায্যে ধান, চাল, গম, মাছ ছাড়াও শুকোনো যাবে কেরালার প্রধান দুটি উৎপাদন—নারকোল ও কাজু বাদাম। এই যন্ত্রে একসঙ্গে 3500টি নারকোল শুকোতে দেওয়া যায়। প্রচলিত পদ্ধতিতে যেখানে সময় লাগে ছয় দিন, এখানে তা মাত্র দেড় দিনেই সারা যাবে। সূর্যের আলোয় এতে তাপমাত্রা উঠে যায় 110 ডিগ্রি পর্যন্ত।

কালিফোর্নিয়ায় "সোলার—1" নামে 10 মেগাওয়াট ক্ষমতার সৌর তাপ-বিদ্যুৎ কেন্দ্রে "সেন্ট্রাল টাওয়ার" পদ্ধতিতে (49 পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) বিদ্যুৎ উৎপাদিত হচ্ছে। এখানে কম্প্যুটার পরিচালিত 1818টি প্রতিফলকযুক্ত হেলিওস্টাট ব্যবহৃত

হচ্ছে। এই সঙ্গে "সোলার—100" নামে অপর একটি অধিক ক্ষমতার বিদ্যুৎ কেন্দ্রও গড়ে উঠছে। এ ছাড়া এক মেগাওয়াটের ছোট ছোট কেন্দ্র বসানো হয়েছে কুয়েত ও স্পেনে।

কালিফোর্নিয়া শহরে সৌরকোষ থেকে বিদ্যুৎ তৈরী হচ্ছে কয়েক বছর ধরেই। এক মেগাওয়াট ক্ষমতার এখানকার একটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ব্যয় গত দু বছরে ওয়াট প্রতি 8 থেকে 5 ডলারে কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে।

ভারতের সেণ্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড (সি. ই এল) সৌরকোষ বা ফটো-ভোল্টেইক কোষ তৈরীতে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এদের তৈরী সৌর-কোষের সাহায্যে জল তোলার পাম্প চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। খরচ কমানোর দিকে নজর রাখা হয়েছে। এর ফলে বহু গ্রামে পানীয় জলের অভাব ও সেচের জলের চাহিদা মিটবে। এখনই একটি পরীক্ষামূলক পাম্পের সাহায্যে শাহিবাবাদে চার মিটার গভীর কুয়ো থেকে দিনে প্রায় 12000 লিটার পর্যন্ত জল তোলা সম্ভব হয়েছে।

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা ডি এস টি-র সাহায্য পেয়ে চরসারতী গ্রামে সৌর সঞ্জীবিত শক্তি কেন্দ্র গড়ে তুলেছেন। ছোট সূচনা—সম্পূর্ণ সৌরশক্তি দিয়ে একটি টিভি সেট আর দুটি লাইট চালানো হচ্ছে। 288টি সৌরকোষের সাহায্যে সর্বোচ্চ 100 ওয়াট বিদ্যুৎ এ থেকে পাওয়া যায়। এই শক্তি জমা থাকে ক্লোরাইড ইণ্ডিয়ার কাছ থেকে উপহার হিসেবে পাওয়া দুটি লেড-অ্যাসিড সঞ্চয়ক কোষে। ঐ সঞ্চয়ক কোষ থেকে প্রয়োজনমতো বিদ্যুৎ পাওয়া যায়। গবেষকরা শীঘ্রই এভাবে সেচের জল তোলা, ধান ভাঙার মেসিন চালানো এসব করতে পারবেন বলে আশা করছেন। সূচনাটা সামান্যই। কারণ সমজাতীয় কাজ উন্নত দেশগুলোতে হচ্ছে আরও ব্যাপক আকারে।

আমেরিকায় গোটা একটি গ্রাম শুধুই সৌরশক্তি থেকে তাদের সমস্ত শক্তি চাহিদা মেটাচ্ছে। সৌদি আরবেও দুটি গ্রামে 350 কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন সৌরশক্তি কেন্দ্র বসানোর কাজ আরম্ভ হয়েছে। চালু হলে এটি হবে বিশ্বে এ জাতীয় শক্তি কেন্দ্রগুলির মধ্যে বৃহত্তম। এতে একটি সৌর-গ্রামের প্রায় তিন হাজার অধিবাসীর প্রয়োজন মেটাবে।

"সৌর শহর" গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে ইরাণেও। এখানে 4000 অধিবাসীর প্রয়োজনীয় শক্তি সংগ্রহ করা হবে সৌর কিরণ, বায়ু-শক্তি,

শহরের আবর্জনা (বায়োমাস) ও নোংরা জল থেকে। ইরাণে সৌর-কিরণের প্রাচুর্য এই পরিকল্পনাকে সফল করে তুলতে খুবই সহায়ক হবে।

সম্প্রতি পশ্চিম জাভার পিঁকোতে অনুরূপ "সোলার ভিলেজ" গড়ে তোলা হয়েছে। এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে বোর্ড অফ্‌ টেক্‌নোলজিক্যাল্‌ স্টাডিজ এণ্ড অ্যাপ্লিকেশন।

পাকিস্তানে চারটি গ্রামের 2100 অধিবাসীর জন্যে গ্রামীণ শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় অর্থ (1 মিলিয়ন ডলার) সাহায্য হিসেবে দেবে রাষ্ট্রপুঞ্জ।

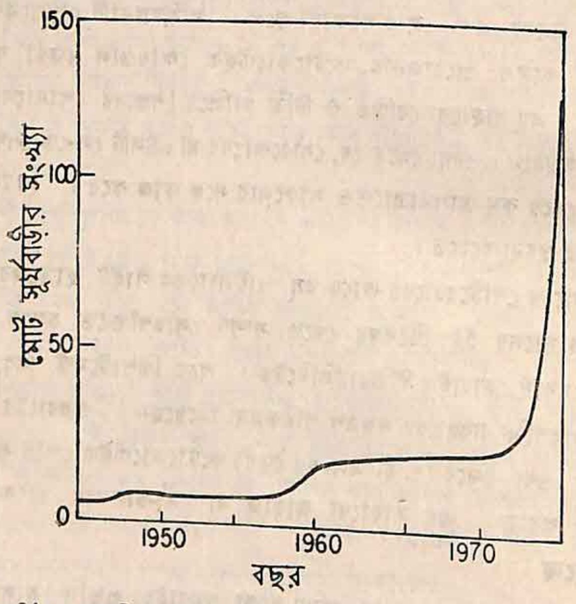
সৌরশক্তিকে একযোগে শিশুদের বিনোদন আর শিক্ষায় সার্থকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে শ্রীনগর এবং লে-র সরকারী স্কুলে। পরিকল্পনাটি রাষ্ট্রপুঞ্জের শাখা ইউনিসেফের হলেও প্রয়োজনীয় ফটোভোল্টেইক কোষগুলি তৈরী করেছেন সি. ই. এল। এর সাহায্যে রেডিও ও টিভি চালিয়ে শিশুদের শোনানো হচ্ছে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান। দেখা গেছে যে, সৌরকোষের মডিউলটি লে-তে সেখানকার শূন্য ডিগ্রির চেয়ে কম তাপমাত্রাতেও সাফল্যের সঙ্গে কাজ করে। 1978 সালে এই কর্মসূচীর সূচনা হয়েছে।

আন্দামানের পোর্টব্লেয়ারের কাছে রস্‌ আইল্যাণ্ডের লাইট হাউজের আলো বিগত 1974 সালের 5ই ডিসেম্বর থেকে সম্পূর্ণ সৌরশক্তিতে চলছে। এটি বসিয়েছেন মেসার্স ক্লোরাইড ইণ্ডিয়া লিমিটেড। পরে ডিপার্টমেণ্ট অব্‌ লাইট হাউজেস সৌরশক্তি ব্যবহারের অনুরূপ পরিকল্পনা নিয়েছেন। গুজরাটের দ্বারকা বন্দরে এবং ওখা বন্দরে সি. ই. এল-এর তৈরী ফটোভোল্টেইক কোষ সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে। এর সাহায্যে জাহাজ বা নৌ-চালনার সংকেত-বাতি জ্বালানো হচ্ছে।

ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন শহরের (যেমন বাণ্ডুং, সুরবাইয়া প্রভৃতি) হাসপাতালে সৌরশক্তির সাহায্যে জল গরম করার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

তবে সৌরশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগে ইজরায়েলের অগ্রগতি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। ইজরায়েলের লর্ডস্‌ বিমানবন্দরে নেমে গাড়ীতে যে কোনও দিকে যাওয়া যাক না কেন নজরে পড়বে প্রায় সব বাড়ীরই ছাদে বসানো সারি সারি সৌরশক্তি সংগ্রাহকের প্যানেল। প্রকৃতপক্ষে সৌরশক্তির মাথাপিছু ব্যবহার বিশ্বে সবচাইতে বেশী ইজরায়েলে। এ ব্যাপারে সরকারী সাহায্যনীতি খুবই

উদার। জনগণের সক্রিয় উৎসাহও যথেষ্ট। গৃহস্থালীর কাজে সৌরশক্তির এই ব্যবহার ছাড়াও সৌরশক্তির সাহায্যে প্রতি বছর 12 কোটি টন জল বাষ্পীভূত করে ইজরায়েল প্রচুর পরিমাণে পটাশ উৎপন্ন করে ডেড্ সী থেকে। ইজরায়েল সরকার ঠিক করেছেন যে এখন থেকে সরকার যত বাড়ী তৈরী করবেন তাদের প্রত্যেকের ছাদে সৌরশক্তি থেকে জল গরমের ব্যবস্থা থাকবে। এর অর্থ হল শতকরা 60 ভাগ গৃহস্থ বাড়ী আগামী দশ বছরের মধ্যে তাদের রান্না-খাওয়া, স্নান ইত্যাদি কাজের জন্য অধিকাংশ শক্তিই পাবেন সূর্য থেকে। ইতিমধ্যেই তাদের যে তিন লক্ষ এ জাতীয় সৌরশক্তির ইউনিট আছে তা দিয়ে বছরে 14 লক্ষ ডলার মূল্যের তেল আমদানী বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। 1991 সাল



চিত্র—24 : আমেরিকায় 'সূর্য বাড়ী' ক্রমেই জনপ্রিয় হচ্ছে—সংখ্যায় বাড়ছে প্রতি বছর

নাগাদ আশা করা যায় যে, মোট ব্যবহৃত শক্তির 15 শতাংশই ইজরায়েল সৌরশক্তি থেকে সংগ্রহ করতে পারবে। আমেরিকাতেও 'সূর্য বাড়ীর'[1] (আলোকচিত্র—4) সংখ্যা সত্তরের দশক থেকে দ্রুত বাড়তে শুরু করেছে (চিত্র—24)।

1. যে বাড়ীর যাবতীয় শক্তি চাহিদা মেটান হয় সৌরশক্তি দিয়ে।

পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চীনও এগিয়ে চলেছে। বেজিং-এর একটি সেলুনের বাড়ীর ছাদে 40 বর্গমিটার জায়গা জুড়ে যে সৌরশক্তি সংগ্রাহক বসানো হয়েছে তার সাহায্যে বছরে 7 মাস খদ্দেরদের চুল ধোয়ার গরম জল পাওয়া যাচ্ছে। তাছাড়াও নাকি ঐ দোকানের 30 জন কর্মচারী দুবেলা গরম জলে চান করে থাকেন।

শিল্পে সৌরতাপন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে দেশে-বিদেশে। ভারতবর্ষে বস্ত্রশিল্পই হল শিল্পে সৌরশক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে পথিকৃৎ। আমেদাবাদে ন্যাশানাল টেক্সটাইল কর্পোরেশনের একটি ইউনিট জল গরম করে বাষ্পে পরিণত করার কাজে সফলভাবে সৌরশক্তি ব্যবহার করছেন। প্রাথমিক পরীক্ষা অনুযায়ী দিনে তিন লক্ষ ক্যালরি সৌরশক্তি পাওয়া যাবে, যার ফলে সাশ্রয় হবে এক কুইণ্টাল করে কয়লা। ফলে বছরে মোট সাশ্রয় হবে 21 হাজার টাকারও বেশি। তবে ইস্পাত শিল্পে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর প্রথম নজির গড়ে তুলল ভারতের টাটা আয়রণ এণ্ড স্টিল কোম্পানী (টিস্‌কো)। 1984 সালের মে মাসে টিস্‌কোর জামসেদপুর কারখানায় 4 লক্ষ টাকা ব্যয় করে এই সৌরতাপন ব্যবস্থা চলু করা হয়েছে। এর সাহায্যে জ্বালানী তেলের একটি ট্যাংককে উত্তপ্ত করে 80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখা হয়। ফলে এর তরলতা বাড়ে ও সরবরাহে সুবিধা হয়। এটি তৈরী করেছে বরোদার একটি সংস্থা।

সেণ্ট্রাল সল্ট এণ্ড মেরিন কেমিক্যাল্‌স্ রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট্ বিশালাকৃতির সৌর-পাতন যন্ত্র বসিয়েছে গুজরাটের কচ্ছ প্রদেশে, লাক্ষা দ্বীপে, ভাবনগরের আওনিয়া গ্রামে ও রাজস্থানের কুরু জেলায়। প্রতিদিনে এদের উৎপাদন ক্ষমতা হল যথাক্রমে চব্বিশ শ', দু' হাজার, পাঁচ হাজার ও আট হাজার লিটার। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের সুন্দরবন অঞ্চলের জন্য এরাই সৌরপাতন প্ল্যাণ্টের একটি নক্সা তৈরী করেছেন।

এদিকে সোলার কুকার নিয়ে অন্যান্য দেশের মতো আমাদের দেশেও অনেক দিন থেকে গবেষণা চলছে। এই কিছুদিন আগে এই জাতীয় আর একটি উনুন তৈরী করেছেন দিল্লীর শ্রী ভীমসেন ভোলা। গোটা উনুনটির দাম মাত্র 120 টাকা। শুধু জ্বালানী বাঁচে তাই নয়, রান্নাবান্নাগুলি পুষ্টিগত মানের বিচারেও উন্নত ধরনের। কেননা, এভাবে রাঁধলে ভিটামিনের অপচয় কম হয়। এজাতীয় উনুন সাধারণতঃ খোলা জায়গা ছাড়া কাজ করতে পারে না। এই অসুবিধা দূর

করেছেন শ্রীহরিকোটার ইণ্ডিয়ান স্পেশ. রিসার্চ অর্গানাইজেশনের বিজ্ঞানীরা। এই ধরনের কুকারের দাম একটু বেশি (450 টাকা)। কিন্তু জ্বালানীর যে সাশ্রয় হবে তাতে দেড় বছরেই খরচ উঠে যাবে। এখানে প্যারাবলয়েড সংগ্রাহকের ফোকাস বিন্দুতে সৌরশক্তিকে কেন্দ্রীভূত করা হয়। ওই ফোকাস ছায়াতে রাখা সম্ভব। ওই ফোকাস বিন্দুতে রান্না চাপিয়ে তাই রাঁধুনীও ছায়ায় বসে কাজ করতে পারেন।

গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেখানে বিদ্যুৎ অমিল সেখানে প্রায়ই ওষুধপত্র নষ্ট হয়ে যায় ফ্রিজের অভাবে। এ সব জায়গায় ব্যবহারোপযোগী সৌরশক্তিচালিত ফ্রিজের পরিকল্পনা ও ডিজাইন প্রস্তাবিত হয়েছে। এমনকি কোল্ড স্টোরেজে ফলমূল, আলু, শস্য প্রভৃতির সংরক্ষণে সৌরশক্তিকে ব্যবহারের পরিকল্পনা নিয়েছেন বেশ কিছু ভারতীয় সংস্থা।

সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর অভিনব বাস্তবধর্মী পরিকল্পনা অধুনা বিজ্ঞান পত্রিকাগুলিতে বেশি সংখ্যায় বেরোচ্ছে। এমনই এক বিস্তারিত পরিকল্পনা হালে দিয়েছেন এ. কে. রাজবংশী। তাঁর প্রস্তাবমতো আরব সাগরের লোনা জল থেকে প্রতি বছর 5·25 কোটি ঘন মিটার স্থপেয় জল তৈরী করে তা দিয়ে থর মরুভূমির কয়েক লক্ষ অধিবাসীর তৃষ্ণা নিবারণ করা সম্ভব। সুবিশাল পরিকল্পনা। তবে যাবতীয় খুঁটিনাটি হিসেব সবটা ধরেও বলা যায় যে অবাস্তব নয়।

সৌরশক্তির ছোটখাট কিন্তু আকর্ষণীয় আর মজাদার বেশ কিছু প্রয়োগের খবর আজকাল প্রায়ই নজরে পড়ে। বিগত 1981 সালের অক্টোবরে কলম্বোর বিজ্ঞানীরা শুধুমাত্র সৌরশক্তি দিয়ে চলতে পারে এমন একটি মোটর সাইকেল তৈরী করেন। এজাতীয় প্রচেষ্টা বিশ্বে প্রথম। গড়ে ঘণ্টায় ছাপ্পান্ন কিলোমিটার বেগে এই সাইকেল ছুটতে পারে। কিন্তু 32 কিমি-এর বেশি একনাগাড়ে চালানো অসুবিধাজনক। জ্বালানী খরচ নেই এক পয়সা!

পরিবহনের ক্ষেত্রে সম্ভবতঃ সবচেয়ে চমকপ্রদ খবর হল সৌরশক্তির সাহায্যে এরোপ্লেন চালানো। ক্যালিফোর্নিয়ার পদার্থবিদ পল ম্যাক্‌ক্রিডি সেটা সম্ভব করেছেন। গ্লাইডার জাতীয় এই প্লেনের ডানায় বসানো আছে 16,128টি সৌরকোষ। এরা সৌরকিরণ থেকে যে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে তারই সাহায্যে চলে 2 কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি মোটর। এই দিয়েই ম্যাক্‌ক্রিডি ইংলিশ

চ্যানেল পাড়ি দিয়েছেন—পৌঁছে গেছেন প্যারিস থেকে ইংল্যাণ্ড। পেট্রোল-খরচ ?—এক পয়সাও না।

পেট্রোল না লাগলেও আনুষঙ্গিক অন্যান্য খরচ প্রচুর। বিশেষ করে সৌর কোষের দাম আকাশছোঁয়া। তবে বিজ্ঞানীরা আশা করছেন যে শীঘ্রই এর দাম কমানো সম্ভব হবে। এই আশা যে মিথ্যে নয় এমন প্রমাণও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবরে পাওয়া যাচ্ছে। সম্পূর্ণ দেশজ পদ্ধতিতে সস্তায় সৌরকোষ তৈরীর পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের ভাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে কাজ চলছে। এদের তৈরী সিলিকন সেল ব্যবহৃত হয়েছে ভারতীয় উপগ্রহ "ভাস্কর"-এ।

ওপরের আলোচনা থেকে দেখা যাচ্ছে যে সৌরশক্তিকে ব্যবহার করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা সৌরকোষ ও সৌরসংগ্রাহকদের সাহায্যই বেশি বেশি করে নিয়েছেন। এছাড়া সৌরশক্তিকে বাঁধবার আরও যে সব বিভিন্ন সম্ভাব্য পথের কথা আলোচিত হয়েছে অদূর ভবিষ্যতে সেগুলি আরও বেশি করে কাজে লাগানো হবে মনে হয়। এইভাবে ক্রমশঃই মানুষ এগিয়ে যাবে এক সৌর সভ্যতার দিকে ; সার্থক অর্থে সে হয়ে উঠবে সৌর উপাসক।

সৌরশক্তির ভবিষ্যৎ

"আমরা সৌর সভ্যতার দিকে এগিয়ে চলেছি"—উইলিয়াম্‌স্‌

"সূর্য-শহর"[1] আর কতদূর ?

সৌরশক্তির উপর ভিত্তি করে যে একদিন মানব সভ্যতার ইমারৎ গড়ে উঠবে এমন ভবিষ্যৎবাণী শুধুমাত্র উইলিয়াম্‌স্‌ই করেন নি, তাঁর মতো আশাবাদী অনেকেই এই শুভ দিনটির জন্যে অপেক্ষা করে রয়েছেন। এমন কি অনেকের ধারণা সেই দিনটি আর বেশি দূরে নয়। এর বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন এমন লোকের সংখ্যা কিন্তু আজও বিরল নয়। তবে সুখের কথা যে, প্রথম দলটি সংখ্যায় ক্রমাগত ভারী হচ্ছে। কারণ পৃথিবী জুড়ে, সৌরশক্তিকে ঘিরে চিন্তা-ভাবনার আর ব্যবহারিক ক্ষেত্রে একে কাজে লাগানোর যে ব্যাপক প্রচেষ্টা বহুকাল ধরে চলে আসছে, সম্প্রতি তাতে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ হয়েছে। আর সেই আশার আলো একটু একটু করে নিরাশার আঁধারকে সরিয়ে দিচ্ছে। ফলে উৎসাহ, উদ্দীপনা আর নতুন উদ্যম নিয়ে বিজ্ঞানীরা এগিয়ে আসছেন আগামী দিনের শক্তির মন্বন্তরের বিভীষিকা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে সাধের "সূর্য-শহর" গড়ে তোলার পরিকল্পনা সার্থক করতে। নিরাশাবাদীদের মুখে অবশ্য অন্য কথা—

"দূরের বাদ্য লাভ কি শুনে ?
মাঝখানে যে বেজায় ফাঁক।"

অস্বীকার করার উপায় নেই যে, "সূর্য-শহর" গড়ে তোলার পরিকল্পনা এখনও 'দূরের বাদ্যের' মতো শোনায়। তবে এই দূরত্বকে অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হলেও যে অসাধ্য নয়, তার প্রমাণ হল আমেরিকার শুচুলি (Schuchuli) শহরে এহেন পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ। আসল কথা হল, সৌরশক্তি বিষয়ক গবেষণা দীর্ঘদিনেও শৈশবাবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারেনি—এখনও পরীক্ষামূলক স্তরে সীমাবদ্ধ বলা যেতে পারে (একমাত্র মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্র ছাড়া)। কারণ ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সৌরশক্তির প্রয়োগের পথে পর্বততুল্য নানান বাধা রয়েছে।

1 যে শহরের যাবতীয় শক্তি চাহিদা শুধুমাত্র সৌরশক্তি ব্যবহার করে পাওয়া যায়।

এই সব বাধাকে পাশ কাটিয়ে এগোনোর রাস্তা বার করাও গবেষণার অঙ্গ। তাই চাই ব্যাপকতর গবেষণা।

এই বাধাগুলির মধ্যে প্রধান হল অর্থনৈতিক বাধা। দেখা গেছে যে চিরাচরিত শক্তিগুলির তুলনায় সৌরশক্তির ব্যবহার প্রচুর ব্যয়সাপেক্ষ; এমন কি অধিকাংশ ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে। একে সর্বসাধারণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে অর্থাৎ এর জনপ্রিয়তা বাড়াতে হলে এই বাধাটি অবশ্যই দূর করতে হবে। তাই সৌরশক্তি সংক্রান্ত গবেষণার আজ প্রধান লক্ষ্য হল উৎপাদন ব্যয় যথাসাধ্য কমিয়ে এনে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় একে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেওয়া। ভারতের মতো গরিব দেশে সার্বজনীন সাড়া পেতে হলে এই প্রতিযোগিতায় একে অবশ্যই জিততে হবে। পরিকল্পনামতো কাজ এগিয়ে চলেছে দেশ-বিদেশের গবেষণাগারে এবং এর সুফলও ফলতে শুরু করেছে। ফটোভোল্টেইক কোষের দাম আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কুড়ি থেকে তিরিশ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে আনার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

সৌরশক্তির ব্যবহারের ক্ষেত্রে আর একটি বড় বাধা হল প্রযুক্তিগত ত্রুটি-বিচ্যুতি। যদিও বহুদিন আগে সৌরশক্তি সংক্রান্ত গবেষণা শুরু হয়েছে, তবু বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় অবধি একে কাজে লাগানোর কথা তেমন আন্তরিক-ভাবে ভাবা হয় নি। তেমন গুরুত্বও দেওয়া হয়নি। ফলে প্রযুক্তিবিদ্যার অন্যান্য শাখার মতো এটি তেমন উৎকর্ষ লাভ করেনি। অথচ ক্রমবর্ধমান শক্তির চাহিদা, ক্রমক্ষীয়মান প্রচলিত শক্তির ভাণ্ডার, আর শক্তিকে ঘিরে অর্থনীতি ও রাজনীতির পাশা খেলা এই সবের চাপে আজ মানুষ সত্যিই এর কৃপাপ্রার্থী। কিন্তু অবহেলাবশে পরশপাথরটিকে সে আজও খুঁজে পায়নি। আর এই পরশপাথর খোঁজার কাজ চলেছে দেশ-বিদেশের গবেষণাগারে। নানান কাজে সৌরশক্তি ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নতুন নতুন পদ্ধতির উদ্ভাবন করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে বাস্তবক্ষেত্রে তার কার্যকারিতা আর জনগ্রাহীতার সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ক্রমবর্ধমান এই অগ্রগতির ধারা বজায় থাকলে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে সৌর গবেষণার জগতে বিপ্লব ঘটে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

গবেষকরা বলেন যে বিশ্বের সব সভ্যতাই কোনও না কোনও সময় সূর্য উপাসনার স্তর পেরিয়ে এসেছে। বর্তমান যুগ বোধহয় নতুনভাবে সৌর উপাসনার যুগ।

ভারতবর্ষে সৌরশক্তি বিষয়ক গবেষণা :

ভারতে বর্তমানে উৎপাদিত কুড়ি কোটি কিলোওয়াট পরিমাণ বিদ্যুতের ষাট শতাংশ আসে তাপ ও পরমাণু শক্তি থেকে আর বাকিটা হল জলবিদ্যুৎ। এই উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমান শতকের শেষে বাড়িয়ে দশগুণ করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে মাথাপিছু শক্তি খোরাক প্রায় নয় গুণ বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে হাজার কিলোওয়াট-আওয়ারের মতো। এদিকে ভারতে আবিষ্কৃত কয়লার পরিমাণ দেখা গেছে 26,000 মিলিয়ন টনের মতো (হিসাব অনুযায়ী সঞ্চিত কয়লার পরিমাণ 83,000 মিলিয়ন টন)। সম্ভবতঃ আগামী দেড়শ বছরেই এ সঞ্চয় নিঃশেষিত হবে। তেলের অবস্থাও তথৈবচ। এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত তেলের পরিমাণ 4,200 মিলিয়ন টন। এই তথ্যাবলী এই মুহূর্তে নিরাশার কারণ না হলেও অদূর ভবিষ্যতে দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াবে সন্দেহ নেই। অথচ অপ্রচলিত উৎসগুলির মধ্যে একমাত্র সূর্যের আলো থেকেই 1.6×10^{14} কিলোওয়াট-আওয়ার পরিমাণ শক্তি পাওয়া যেতে পারে। এছাড়া রয়েছে জোয়ার-ভাটা, বায়ু, বায়োমাস ও ভূ-তাপীয় উৎস। এই অপ্রচলিত শক্তিগুলিকে, বিশেষ করে সৌরশক্তিকে কাজে লাগানোর আজকের এই প্রচেষ্টা ও উদ্যম তাই সঙ্গত এবং সময়োপযোগী।

পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে 1985 সালের জানুয়ারী মাসে ভারত সরকারের মন্ত্রণালয়ে 'অপ্রচলিত শক্তি' বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ পৃথক দফতর খোলা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে, বিষয়টি সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীতেও কতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। কাউন্সিল্ অফ সাইন্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ, টাটা এনার্জি রিসার্চ ইন্‌স্টিট্যুট্ প্রভৃতির আর্থিক অনুদানে দেশের বিভিন্ন গবেষণাগারে এ বিষয়ে গবেষণা চলেছে। উদ্দেশ্য হল 1990 সাল নাগাদ দেশের শক্তি চাহিদার এক-তৃতীয়াংশ অপ্রচলিত উৎস থেকে সংগ্রহ করা।

এদেশে মোট সাতাশটি গবেষণা কেন্দ্র আজ সৌরশক্তি সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত রয়েছে। এদের সাহায্য করে চলেছে আবহাওয়া দফতর, মহাকাশ গবেষণা সংস্থা এবং আরও অনেকে। সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন বেশ কিছু শিল্প প্রতিষ্ঠানও।

গবেষণার কাজ সুষ্ঠু ও ত্বরান্বিত করার জন্যে ভারত সরকারের এনার্জি রিসার্চ কমিটি একই বিষয়ে গবেষণারত বিভিন্ন কেন্দ্রের মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলার সুপারিশ করেছেন। সমন্বয় সাধনের ভার থাকছে একটি কেন্দ্রের উপর।

এই যৌথ গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি হল : নতুন ধরনের সেমিকণ্ডাক্টর আবিষ্কার, সৌর কোষের দক্ষতা বাড়ানো ও নির্মাণ ব্যয় কমানো, মহাকাশে ব্যবহারযোগ্য বিশেষ ধরনের সৌর কোষ নির্মাণ, ছোট ছোট বিকেন্দ্রীভূত বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন, চাষাবাদের কাজে উপযোগী সৌর পাম্প, ঘরোয়া কাজে ও শিল্পে ব্যবহারযোগ্য উত্তপ্ত জল তৈরী, লোনা জল থেকে লবণ ও সুপেয় জল তৈরী, বরফ তৈরী, কৃষিজ দ্রব্যের সংরক্ষণে গুদাম ও বাসস্থান ঠাণ্ডা রাখা, ফল-মূল-শস্য-দুধ শুকোনোর জন্যে প্রয়োজনীয় ড্রায়ার তৈরী, সোলার কুকার নির্মাণ ইত্যাদি।

চার কিলো ওয়াট ক্ষমতার সৌরশক্তি চালিত পাম্প তৈরীর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। একে সার্থক করে তুলতে মিলিতভাবে কাজ করে চলেছে ভারত হেভী ইলেকট্রিক্যাল্স্ (BHEL), পিলানীর বিড়লা ইন্স্টিট্যুট অফ্ টেক্নলজি, অরোভিলে সেণ্টার ফর এন্ভায়রনমেণ্টাল ষ্টাডিজ, ন্যাশানাল ফিজিক্যাল ল্যাবোরেটোরি, পাঞ্জাব এগ্রিকাল্চারাল ইউনিভার্সিটি, মেসার্স জ্যোতি লিঃ, মেসার্স মেটাল বক্স লিঃ এবং আরও অনেকে। সোলার ড্রায়ার নির্মাণ ও তার মান উন্নয়নের কাজ চলেছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ; এতে প্রধান ভূমিকা নিয়েছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ্ এগ্রিকালচারাল রিসার্চ। শিল্পক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য গরম জল ও স্টীম উৎপাদনের কাজে সমন্বয় সাধনের ভার পড়েছে BHEL-এর ওপর। সস্তায় উন্নত ধরনের সৌরকোষ তৈরীর চেষ্টা চলেছে বিভিন্ন গবেষণাগারে ; এক্ষেত্রে যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব পড়েছে সেণ্ট্রাল ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড-এর উপর। সরকারের বিজ্ঞান ও কারিগরী দফতরের তদারকিতে সৌরশক্তি সঞ্চয়ের নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবনের কাজও এগিয়ে চলেছে বিভিন্ন স্থানে। এছাড়া ভেবে দেখা হচ্ছে যে, সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার অনুকরণে কোনও সঞ্চয়ের পদ্ধতি উদ্ভাবন করা সম্ভব কি না। সেণ্ট্রাল সল্ট এণ্ড মেরিন কেমিক্যাল্স্ রিসার্চ ইন্স্টিট্যুট-এর তত্ত্বাবধানে গড়ে উঠেছে একাধিক সৌরপাতন প্রকল্প। গুজরাট, রাজস্থান, তামিলনাড়ু ও লাক্ষাদ্বীপে পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পগুলি কাজ করতে শুরু করেছে।

কাজ যেভাবে এগিয়ে চলেছে তাতে আগামী কয়েক দশকের মধ্যে আমাদের দেশেও শক্তি প্রযুক্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ শুভ পরিবর্তন ঘটে যেতে পারে। আপাততঃ এই সম্ভাবনা খতিয়ে দেখার ভার সুবিবেচক পাঠক-পাঠিকাদের উপর চাপান হল।

একক এবং পরিমাপ

শক্তি সমস্যা যথেষ্ট জটিল। কিন্তু বিবিধ একক এবং পরিমাপের যথেচ্ছ ব্যবহার বিষয়টিকে জটিলতর করে তুলেছে। বিজ্ঞানীমহল তাই একমত হয়ে আন্তর্জাতিক পরিমাপ পদ্ধতি বা SI (*Systeme International d' Unite's*) পদ্ধতির ব্যবহার করতে মনস্থির করেছেন।

SI পদ্ধতিতে পরিমাপের মূল এককগুলি নীচে দেওয়া হল :

ভৌত পরিমাপ	একক: নাম	একক: চিহ্ন
ভর	কিলোগ্রাম	কেজি
দৈর্ঘ্য	মিটার	মি
সময়	সেকেণ্ড	সে
তড়িৎ প্রবাহ	অ্যাম্পিয়ার	এ
তাপমাত্রা	কেলভিন	কে
আলোর ঔজ্জ্বল্য	ক্যাণ্ডেলা	ক্যাণ্ড

বৃহত্তর পরিমাপের জন্যে ওপরের এককগুলিকে দশের গুনিতক হিসেবে লেখা হয়। SI পদ্ধতিতে দশের কত গুণিতক বেশি, তা বোঝাতে এককের নামের আগে গ্রীক শব্দ, আর কত গুণিতক কম তা বোঝাতে নামের আগে ল্যাটিন শব্দ উপপদ হিসেবে বসানো হয়। যেমন ওপরের দিকে ডেকাকেজি (10 কেজি), হেক্টাকেজি (100 কেজি), মেগাকেজি (10^6 কেজি); আর নীচের দিকে ডেসিকেজি (এক কেজির দশ ভাগ), মিলিকেজি (এক কেজির হাজার ভাগ বা 10^{-3} কেজি), মাইক্রোকেজি (এক কেজির দশ লক্ষ ভাগ বা 10^{-6} কেজি) —এমনিধারা ব্যবহৃত হবে। পূর্ণ তালিকা নীচে দেওয়া হল :

গুণিতক	উপপদ	চিহ্ন	গুণিতক	উপপদ	চিহ্ন
10^{12}	টেট্রা	T	10^{-1}	ডেসি	d
10^9	গিগা	G	10^{-2}	সেন্টি	c
10^6	মেগা	M	10^{-3}	মিলি	m
10^3	কিলো	k	10^{-6}	মাইক্রো	μ
10^2	হেক্টা	h	10^{-9}	ন্যানো	n
10	ডেকা	da	10^{-12}	পিকো	p

প্রচলিত পদ্ধতিতে কিন্তু বেশি ব্যবহৃত হয় কোটি, লক্ষ, মিলিয়ান, বিলিয়ান, ট্রিলিয়ান।

একক[a]	গুণিতক	একক[b]	গুণিতক	একক[c]	গুণিতক
হাজার	10^3	মিলিয়ন (=দশ লক্ষ)	10^6	মিলিয়ন (=দশ লক্ষ)	10^6
লক্ষ	10^5	বিলিয়ন (=শত কোটি)	10^9	বিলিয়ন (=লক্ষ কোটি)	10^{12}
কোটি	10^7	ট্রিলিয়ন (=লক্ষ কোটি)	10^{12}	ট্রিলিয়ন (=দশ হাজার কোটি)	10^{18}

শক্তি সম্পর্কিত কোন বই পড়তে গেলে পাঠকের মনে কার্য, ক্ষমতা এবং শক্তি সম্পর্কিত এককগুলির বিষয়ে প্রারম্ভিক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়।

কার্যের (work) SI একক হল 'জুল'। এক নিউটন বল এক মিটার দূরত্ব পর্যন্ত সমদিকে ক্রিয়া করলে এক জুল কার্য করা হবে। কার্য আর শক্তির একক অভিন্ন।

ক্ষমতার একক হল ওয়াট। প্রতি সেকেণ্ডে এক জুল কার্য করলে তা এক ওয়াট ক্ষমতার তুল্য অর্থাৎ,

এক ওয়াট≡এক জুল/সে.

শক্তির SI একক হল কিলোওয়াটআওয়ার (kwh)। এক কিলোওয়াট ক্ষমতার একটি ইঞ্জিন এক ঘণ্টা ধরে কাজ করলে এই শক্তি পাওয়া যায়। কাজেই

এক kwh $\equiv 3{\cdot}6 \times 10^6$ জুল $= 3{\cdot}6$ মেগাজুল

কিলোওয়াট (ক্ষমতার একক) আর কিলোওয়াটআওয়ারের (শক্তির একক) এই পার্থক্য সতর্কতার সঙ্গে মনে রাখা দরকার।

কিলোওয়াটআওয়ার ছাড়া আরও বহুবিধ শক্তি-একক চালু আছে এবং অনেক ক্ষেত্রেই এখনও তারা SI এককের চাইতে অনেক বেশী প্রচলিত। এদের পারস্পরিক সম্পর্ক তাই এখানে দেওয়া হল :

আর্গ (erg)	কিলোওয়াট-ঘণ্টা (kwh)	কিলোক্যালরী (kcal)	ব্রিটিশ থার্মাল একক (Btu)	জুল (Joule)
	1	860	3412	3600000
	0·00116	1	3·97	4188
	0·00029	0·252	1	1055
10^7		0·00024	0·00095	1

[a]ভারতীয় পদ্ধতি [b]আমেরিকান পদ্ধতি [c]ব্রিটিশ পদ্ধতি

বিবিধ প্রচলিত শক্তি এবং ক্ষমতার এককগুলির কয়েকটির সংজ্ঞা নীচে দেওয়া হল :

ব্রিটিশ থার্মাল একক (Btu) = এক পাউণ্ড জলের তাপমাত্রার এক ডিগ্রি ফারেনহাইট বৃদ্ধি ঘটাতে প্রয়োজনীয় তাপ শক্তি।

ক্যালরী (calorie) = এক গ্রাম জলের তাপমাত্রা 14·5 ডিগ্রি থেকে 15·5 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় তুলতে যে পরিমাণ তাপ শক্তি প্রয়োজন হয়।

ব্যারেল = 42 গ্যালন বা 140 কেজি গড় ঘনত্বের অশোধিত তেল থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়।

অশ্বশক্তি = 746 ওয়াট = 746 জুল/সে.।

আয়তনের পরিমাপও বিবিধ এককে প্রকাশ করা হয় এবং তরল কোন জ্বালানীর পরিমাপ বোঝাতে লিটার, কিউবিক ফুট, ব্যারেল, গ্যালন—অন্তত এই চার রকম এককের ব্যবহার হামেশাই চোখে পড়বে। এদের পারস্পরিক সম্পর্কও তাই এখানে দেওয়া হল :

লিটার	কিউবিক ফুট	ব্যারেল	গ্যালন (US)
1	0·0353	0·0063	0·264
28	1	0·178	—
159	5·61	1	42
3·79	0·134	0·09	1

শক্তির ও ক্ষমতার পরিমাপে ব্যবহৃত আরও কিছু বহুল প্রচলিত একক এবং তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নীচে দেওয়া হল :

$1\ Tw = 10^{12}\ w = 10^{9}\ Kw = 10^{6}\ Mw = 10^{3}\ Gw$

$1\ Tw \simeq 14 \times 10^{6}$ ব্যারেল/দিন

$1\ Tw\ year \approx 1 \times 10^{9}$ টন কয়লার তুল্য শক্তি $\approx 0{\cdot}7 \times 10^{9}$ টন তেলের শক্তিতুল্য ≈ 30 কোয়াড

1 কোয়াড $= 10^{15}\ Btu = 33{\cdot}4\ Gw\ years$

$= 3{\cdot}34 \times 10^{10}\ w\ year - 10^{18}$ জুল

$1\ Q \quad = 10^{18}\ Btu = 3{\cdot}34 \times 10^{13}\ w\ year = 293 \times 10^{12}\ kwh.$

$1\ Btu \quad = 252$ ক্যালরী $= 1055$ জুল $= 0{\cdot}293\ wh. = 1055\ ws.$

1 ক্যালরী $= 4{\cdot}19\ ws.$

1 টন কয়লার শক্তিতুল্য $\approx 7 \times 10^6$ k cal = 8140 kwh = 0·93 kw years

1 টন তেলের শক্তিতুল্য $\approx 10 \times 10^6$ kcal = 11,650 kwh

= 1·33 kw years.

1 ব্যারেল তেলের শক্তিতুল্য $\approx$ 1610 kwh = 0·18 kw years.

1 m^3 প্রাকৃতিক গ্যাসের শক্তিতুল্য $\approx$ 9·3 kwh.

1 m^3 তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের শক্তিতুল্য $\approx$ 5580 kwh

= 0·64 kw years.

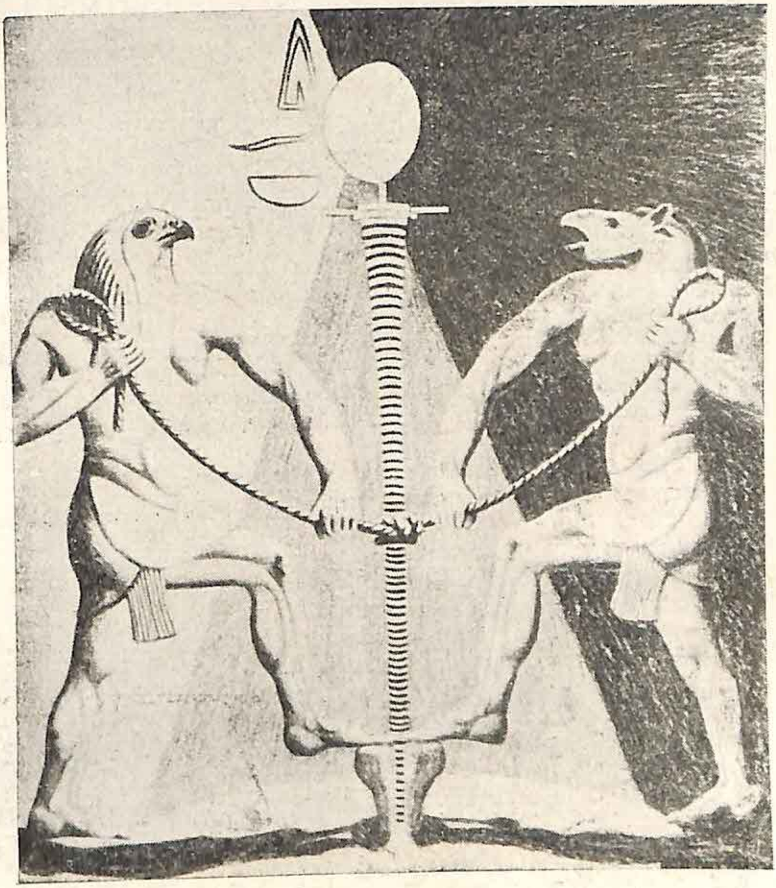
1 কেজি ইউরেনিয়াম অক্সাইড $\approx 180 \times 10^3$ kwh = 20·5 kw years.

(তাপকেন্দ্রীণ চুল্লী)

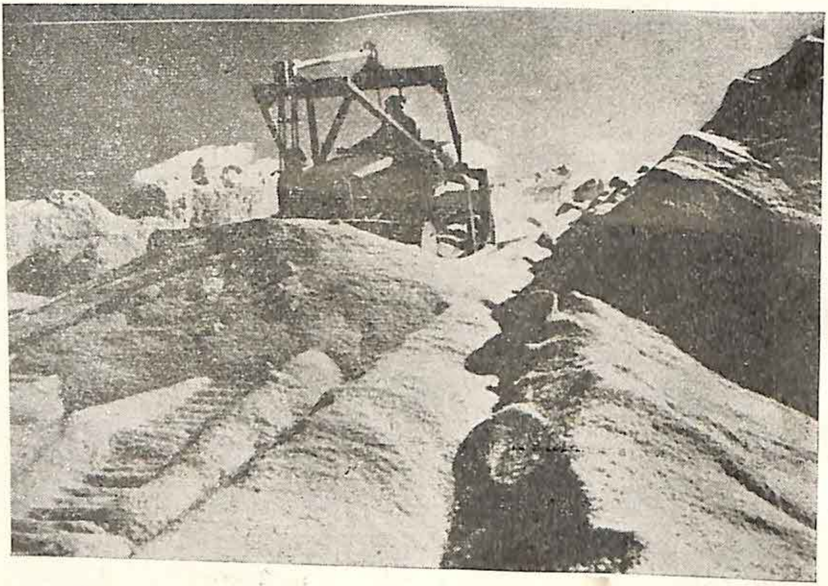
1 কেজি ইউরেনিয়াম অক্সাইড $\approx 12·6 \times 10^6$ kwh = 1438 kw years.

(ব্রিডার চুল্লী)

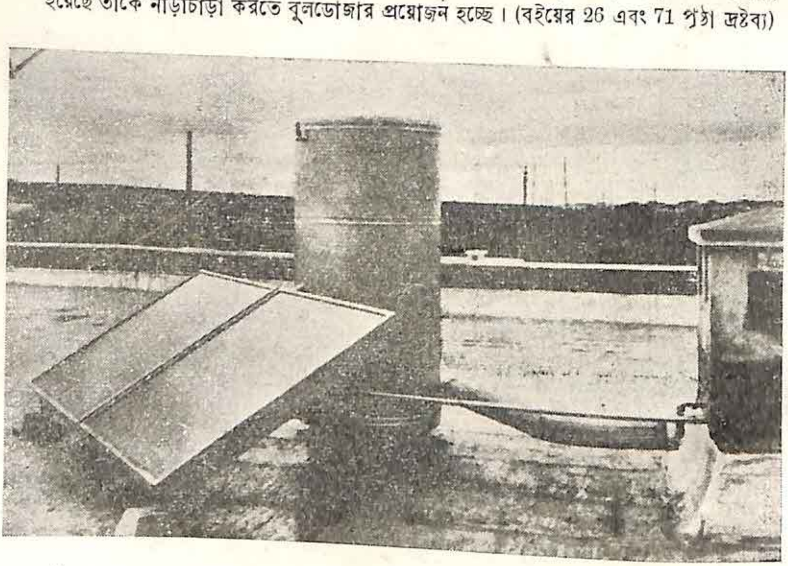
আলোকচিত্র পরিচিতি



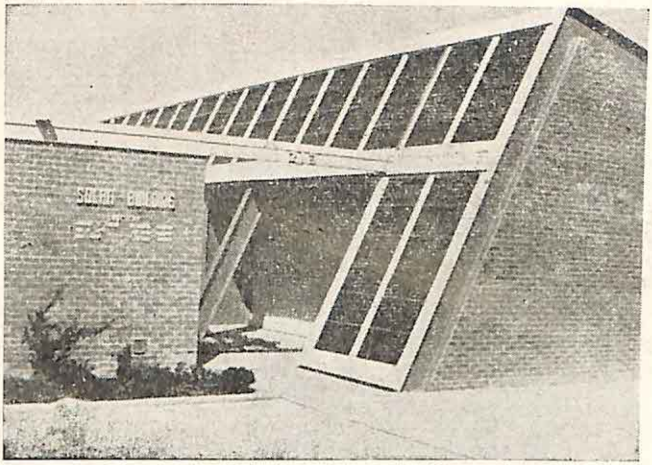
1. মিশরীয় দেবতাদ্বয়, 'রা' এবং 'সেট'। আলোর দেবতা 'রা' আর অন্ধকারের দেবতা 'সেট' অক্ষদণ্ড ঘোরাচ্ছেন—দিন-রাত্রি হচ্ছে। (বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য)



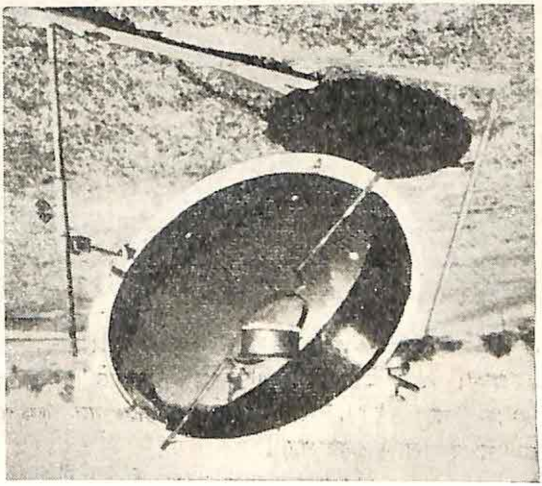
2. সৌরশক্তির সাহায্যে সমুদ্রজল থেকে নুন ঃ যে বিপুল পরিমাণ নুন এই পদ্ধতিতে উৎপন্ন হয়েছে তাকে নাড়াচাড়া করতে বুলডোজার প্রয়োজন হচ্ছে। (বইয়ের 26 এবং 71 পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)



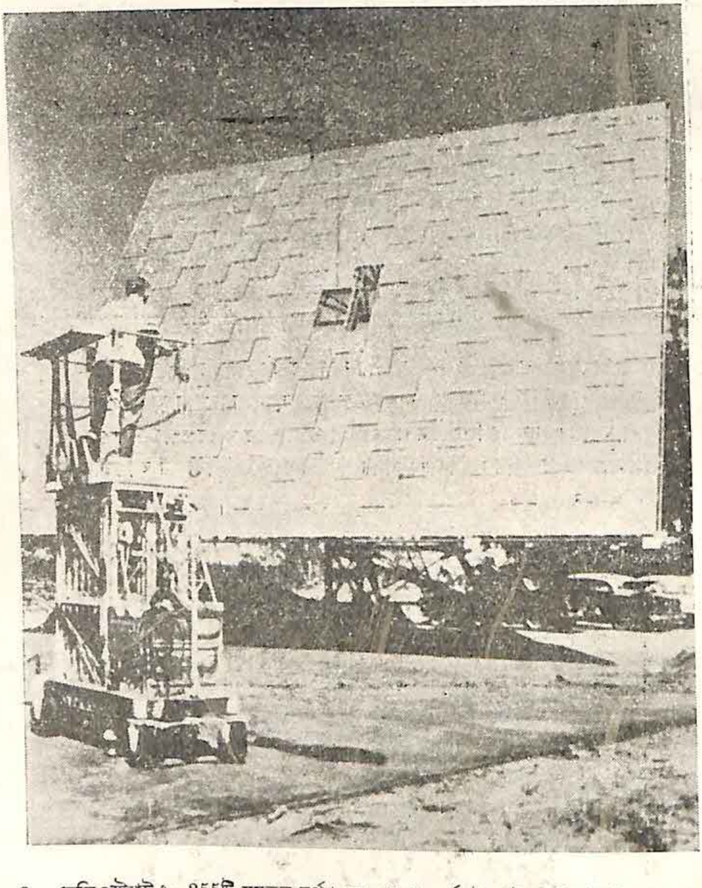
3. সৌরশক্তির সাহায্যে গরমজল ঃ কাঁচঢাকা, তাপ-আবরিত সমতল সংগ্রাহকটির (বাঁ দিকে নীচে) ক্ষেত্রফল 22 বর্গ ফুট। এর ডানদিকে বসান আছে গরমজলের ট্যাঙ্ক; জল ধরে 53 গ্যালন। এর সাহায্যে উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীরা বছরের ন'মাস দৈনিক 40 গ্যালন ক'রে গরমজল পাচ্ছেন। (বইয়ের 29 পৃষ্ঠা এবং চিত্র 11 দ্রষ্টব্য)



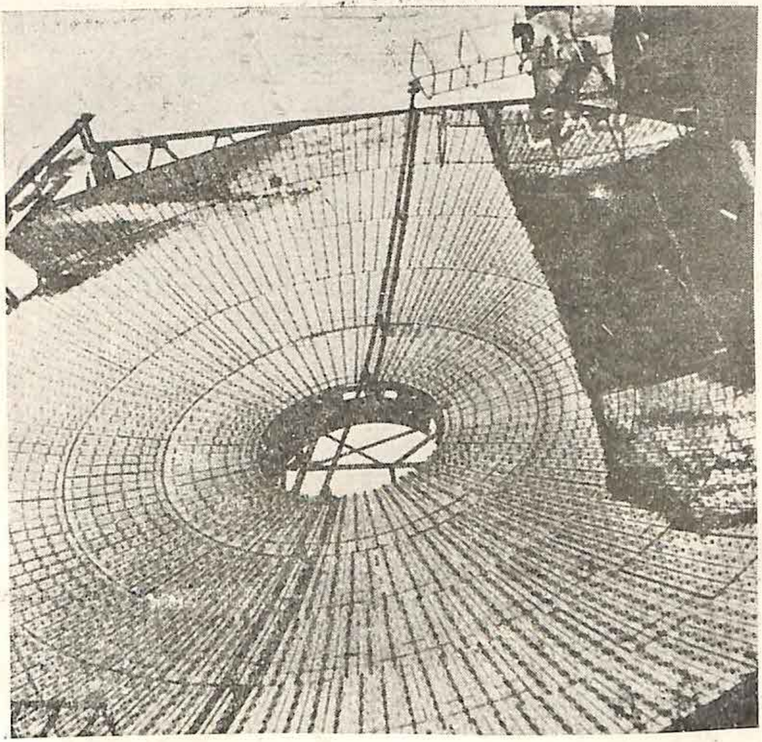
4. নিউ মেক্সিকোর সূর্যবাড়ী : এই বাড়ীর যাবতীয় প্রয়োজনীয় শক্তি সংগৃহীত হয় সৌরশক্তি থেকে। এ জাতীয় বাড়ী তৈরীতে স্থাপত্য-বিদ্যার অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বাড়ীর ডিজাইন এমনভাবে করতে হয় যাতে সৌরতাপ ও বায়ু-শক্তির সর্বোত্তম ব্যবহার সম্ভব হয়। ছবির বাড়িটি স্থাপত্যের বিচারে আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করেছে।



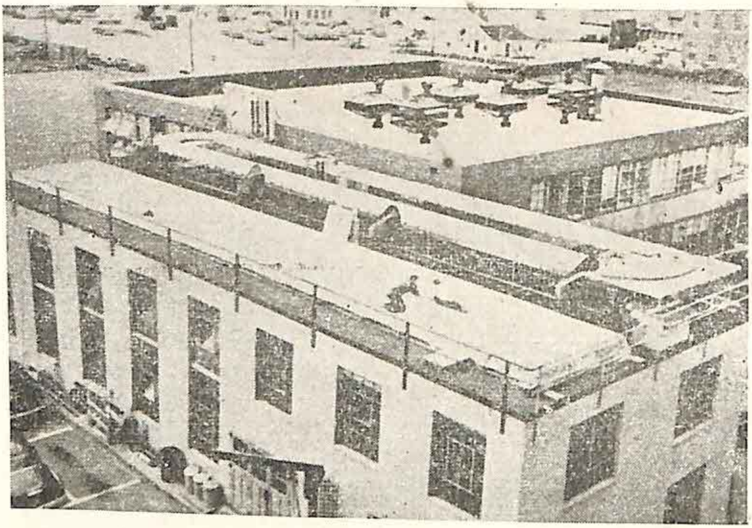
5. অবতল দর্পনযুক্ত সোলার কুকার। দর্পনটি 38 ইঞ্চি ব্যাসের; ক্রোমিয়াম-প্লেট করা। রান্নার পাত্রটি ফোকাসে রাখা আছে। এটির নির্মাতা, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরী। বাক্স-কুকারের চাইতে দাম বেশী পড়ে কিছুটা।



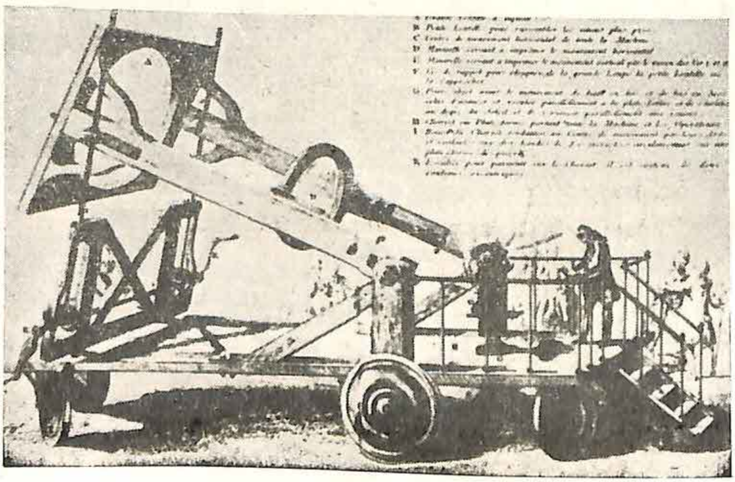
6. হেলিওস্ট্যাট : 355টি সমতল দর্পণ যুক্ত, 1140 বর্গফুট এই হেলিওষ্ট্যাট সোলার ফার্ণেসের অংশ। এরই প্রতিফলিত সৌরালোক গিয়ে পড়ে সোলার ফার্ণেসের অবতল দর্পণে (পরের ছবি)। হেলিওস্ট্যাট সূর্যের সঙ্গে সঙ্গে দিক পরিবর্তন করে, ফলে ফার্ণেসে সারাদিন রোদ পড়ে।



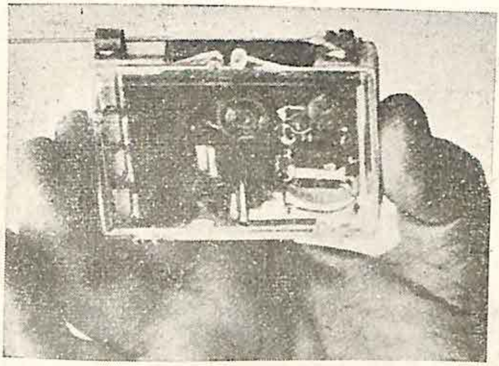
7. সোলার ফার্নেস ঃ ফ্রান্সের মন্ট লুইয়ের এই সৌর চুল্লীটি পৃথিবীর বৃহত্তম।



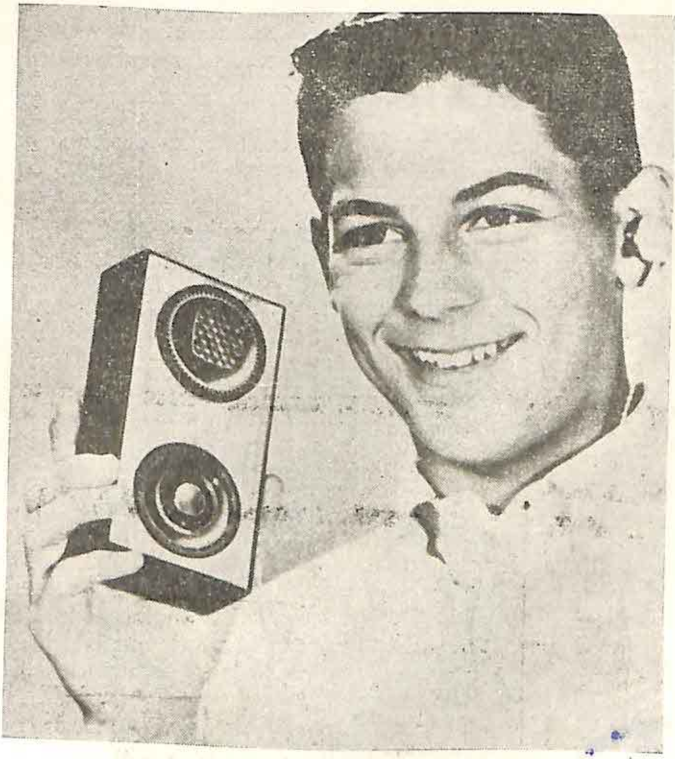
8. বাড়ীর ছাদে শেওলার চাষ। ডিম্বাকৃতি প্লাস্টিকের আধারগুলি (পেছনের বাড়ীর ছাদে) সৌরশক্তি ধরে রাখে—শেওলারা দ্রুত বাড়ে।



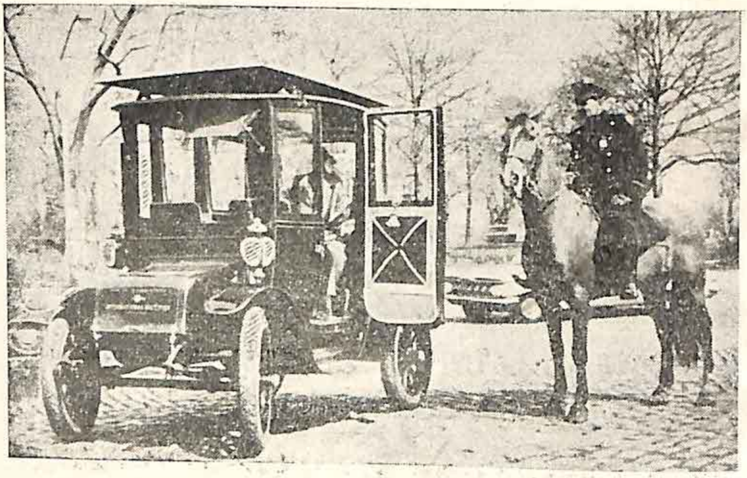
9. উচ্চ-তাপ সংক্রান্ত গবেষণার উদ্দেশ্যে ল্যাভোয়েসিয়ার-এর তৈরী করা সৌরচুল্লী।



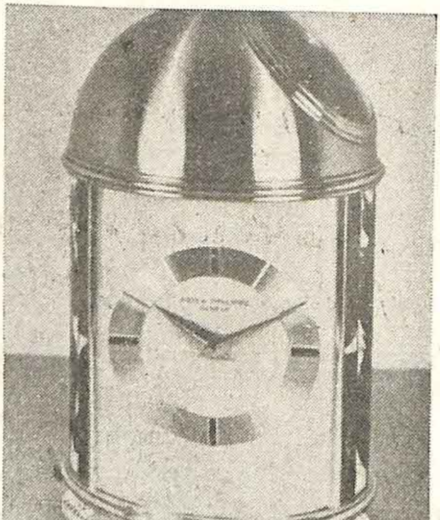
10. সৌরশক্তি চালিত ট্রান্সমিটার।



11. একটি কিশোর সৌরশক্তি চালিত রেডিও শুনছে ; ওপরের চক্রাকৃতি স্থানটিতে সৌরকোষ বসান আছে।



12. সৌরশক্তি চালিত মোটরগাড়ী ; গাড়ীর ছাদে সৌরকোষের প্যানেল বসানো আছে। ডানদিকের অশ্বারোহী পুলিশ অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে চালকের সঙ্গে কথা বলছেন।



13. সৌরশক্তি চালিত ঘড়ি।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ প্রকাশিত ও প্রকাশিতব্য অন্যান্য বিজ্ঞান পুস্তিকা

১। রোগ ও তার প্রতিষেধ / সুখময় ভট্টাচার্য / ৫.০০
২। পেশাগত ব্যাধি / শ্রীকুমার রায় / ৭.০০
৩। আমাদের দৃষ্টিতে গণিত / প্রদীপকুমার মজুমদার / ৭.০০
৪। শক্তি : বিভিন্ন উৎস / অমিতাভ রায় / ৭.০০
৫। মানুষের মন / অরুণকুমার রায়চৌধুরী / ৪.০০
৬। বয়ঃসন্ধি / বাসুদেব দত্তচৌধুরী / ৯.০০
৭। ভূতাত্ত্বিকের চোখে বিশ্বপ্রকৃতি / সঙ্কর্ষণ রায় / ৮.০০
৮। হাঁপানি রোগ / মনীশচন্দ্র প্রধান / ৪.০০
৯। পশুপাখীর আচার ব্যবহার / জ্যোতির্ময় চট্টোপাধ্যায় / ৮.০০
১০। ময়লা জল পরিশোধন ও পুনর্ব্যবহার / ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ / ৬.০০
১১। গ্রাম পুনর্গঠনে প্রযুক্তি / দুর্গা বসু / ১০.০০
১২। একশো তিনটি মৌলিক পদার্থ / কানাইলাল মুখোপাধ্যায় / ১০.০০
১৩। পরিবর্তী প্রবাহ / ডঃ সমীরকুমার ঘোষ / ৭.০০
১৪। বাস্তব সংখ্যা ও সংহতিতত্ত্ব / প্রদীপকুমার মজুমদার / ১০.০০
১৫। অতিশৈত্যের কথা / দিলীপকুমার চক্রবর্তী / ৭.০০
১৬। এফিড বা জাবপোকা / মনোজরঞ্জন ঘোষ / ১২.০০
১৭। সয়াবীন / দ্বিজেন গুহবক্সী / ৯.০০
১৮। পাতালের ঐশ্বর্য / সংকর্ষণ রায় / ১০.০০
১৯। নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্র / সুশীল ঘোষ / ১২.০০
২০। ঘরে করো শিল্প গড়ো / তিলক বন্দ্যোপাধ্যায় / ১১.০০
২১। আমাদের জীবনে পাখি / সুধীন সেনগুপ্ত / ১৪.০০
২২। আবহাওয়া ও আমরা / অপরাজিত বসু
২৩। জৈবসার ও কৃষিবিজ্ঞানে জীবাণুর অবদান / শ্যামল বণিক / ১২.০০
২৪। জিওল মাছ / শচীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় / ১২.০০
২৫। শুষ্ক ও খরা এলাকার চাষ পদ্ধতি / বিমলবিহারী দাস ও বলাইলাল জানা
২৬। সমুদ্র পরিচয় / প্রসাদ সেনগুপ্ত
৭। ক্যাকটাস ও ফুলচাষ / বলাইলাল জানা

নয় টাকা